বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অধ্যায়।*

"শ্রী

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য

চবিত্রং

শ্রীযুত বাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়েন

বচিতং

"কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ ধবণীব মাজ।
যাহার অধিকাবে নবদ্বীপ সমাজ॥
পূর্ব্ব বৃত্তান্ত যত কবিয়া প্রচাব।
কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র পরে কাহব বিস্তাব॥"

লন্দনমহানগরে চাপা হইল

১৮১১।"

বঙ্গভূমিতে হাবিলি পবগণায় বাঁকদি গ্রামে কাশীনাথ বায মহাশয়েব বসতি ছিল পবগণা ও তাহার জমিদাবি কিছু কাল পবে বাজ কবেব কাবণ চাবার শুভাব সহিত বিবাদ উপস্থিত হইল সেই বিবাদে পবাভব হইয়া বনিতাকে সঙ্গে করিয়া দেশ ত্যাগ করিলেন বহু কাল ভ্রমণ কবিতে কবিতে বাগুয়ান পবগণায় বিশ্বনাথ সমাদ্দাবের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। সমাদ্দার যথেষ্ট সমাদব করিয়া নিজালয়েতে অপূর্ব্ব স্থান নিরূপণ করিয়া দিয়া রায়কে এবং বায়েব গৃহিণীকে যত্নপূর্ব্বক পালন করিতে লাগিলেন কিঞ্চিত্ কালান্তরে বায়ের বনিতা গর্ভিণী হইয়া রায়কে কহিলেন হে নাথ বুঝি আমার গর্ভ হইল ইহা শুনিয়া রায় অত্যন্ত কাতর হইয়া কহিলেন রাজ্যচ্যুত হইয়া পরের বাটীতে থাকিয়া রাণী কি প্রকারে প্রসব হইয়া। এবং অনেক অনেক বিলাপ করিলেন। অনেক বিবেচনানন্তর প্রভাতে সমাদ্দারকে সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিয়া কহিলেন হে তাত আমবা তোমার সন্তান সন্ততি আপনি ইহাই বিবেচনা করিয়া যে উচিত হয় তাহাই করিবেন সমাদ্দার অনেক অনেক আশ্বাস কবিয়া কন্যা ভাবে রাণীকে পালন করিতে লাগিলেন বায দেখেন সমাদ্দার আত্ম কন্যাব ন্যাব রাণীকে পালন করিতে প্রবর্ত্ত তখন চিন্তা কবিতেছেন রাজ্য গেল পবের বাটীতে কত কাল বাস এ রূপে করিব ইহাই অন্তঃকবণে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত কাতব হইয়া বিবেচনা করিয়া দেখেন ইহাব উপায় হস্তিনাপুবে না গেলে আমার উপায়ান্তব হইবেক না ইহাই ধার্য্য করিয়া সমাদ্দাবকে না কহিযা এবং আত্ম বনিতাকে না বলিযা হস্তিনাপুবে প্রস্থান করিলেন।

সমাদ্দাব রায়কে না দেখিযা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং বায়েব গৃহিণী বায়েব অন্বেষণ না পাযা বিপদ সাগরে মগ্না ক্ষিপ্তমানা বোদনপবা শোকাকুলা। সমাদ্দাব অতিশয় কাতরা দেখিয়া রাণাকে কহিতেছেন তুমি কন্যা যদ্যপি রায় এরূপ করিলেন আমি তোমাকে প্রতিপালন করিব তুমি কদাচ চিন্তা কবিবা না। তখন রাণী সমাদ্দাবের কথা শ্রবণ কবিয়া স্থিরা হইয়া কহিলেন পিতা তোমা ব্যতিরেকে আমার আর অন্য জন নাই। সমাদ্দার কহিলেন কন্যা কদাচ ভাবনা করিবা না। তখন বনিতা স্থিরা হইলেন সমাদ্দার সর্ব্বদা রাণীকে অধিক স্নেহেতে পালন করেন। সময় ক্রমে রায়ের বনিতা প্রসব হইলেন অপূর্ব্ব বালক দর্শন

---

* রাজীবলোচনের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত ১৮১১ খ্রীঃ লণ্ডন নগরে মুদ্রিত এক অপূর্ব্ব জিনিষ। এই পুস্তকখানি অবিকল মুদ্রিত করিলাম। ইহার অক্ষরগুলি অপূর্ব্ব, বোধ হয়, বহু অর্থ ব্যয়ে হাতের লেখা দেখিয়া লণ্ডনে অক্ষব প্রস্তুত করা হইয়াছিল। পাঠকগণ ইহাতে আধুনিক কুলাঙ্গারদিগের ন্যায় শত বৎসর পূর্ব্বেব বাঙ্গালাব অনেক প্রাচীন স্বদেশদ্রোহী কুলাঙ্গারদিগের তথ্য জ্ঞাত হইতে পারিবেন। ন, স।

করিয়া পরম হৃষ্টা হইয়া কহিলেন পিতাকে ডাক সমাদ্দার উপস্থিত হইলেই কহিলেন পিতা দৌহিত্র দর্শন কর। সমাদ্দার দর্শন করিয়া দেখেন লক্ষণাক্রান্ত দৌহিত্র ভাবে সমাদ্দার পালন করিতে লাগিলেন। সময় ক্রমে অন্নপ্রাশন দিয়া নাম রাখিলেন শ্রীরাম। সকল লোক জানিলেক সমাদ্দারের পরিবার এই হেতু নাম হইল রাম সমাদ্দার॥

এই রূপে কতক কাল যায় রায় হস্তিনাপুর গমন করিলেন কিন্তু পুনরায় আগমন হইল না। সমাদ্দার বিবেচনা করিলেন বালকের যজ্ঞোপবীতের সময় উপস্থিত হইল অতএব প্রধান প্রধান পণ্ডিতের স্থানে জিজ্ঞাসা করি তাহারা যেমত কহেন সেই মত কার্য্য করিব। এই সকল বিবেচনা করিতে করিতে রায়ের দ্বাদশ বৎসর গত হইল। পরে পণ্ডিতের ব্যবস্থা মতে রায়ের শ্রাদ্ধ করাইয়া শ্রীরামের যজ্ঞোপবীত দিয়া বিবাহ দিলেন।

কিছু কালান্তরে শ্রীরাম সমাদ্দারের জায়া গর্ভিনী হইলেন। সময়ক্রমে রাম সমাদ্দারের বনিতা প্রসব হইলেন অপূর্ব্ব বালক সর্ব্ব লক্ষণাক্রান্ত অতিশয় রূপবান চন্দ্রের ন্যায়। রাম সমাদ্দার পুত্রকে দেখিয়া বিবেচনা করিতেছেন বুঝি এই পুত্র হইতে আমাদিগের কুল উজ্জ্বল হইবেক আনন্দার্ণবে মগ্ন হইলেন। পুত্র দিনে দিনে চন্দ্রকলার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন অন্নপ্রাশনাদি দিয়া নাম রাখিলেন ভবানন্দ॥

ক্রমে ক্রমে রাম সমাদ্দারের তিন পুত্র হইল জ্যেষ্ঠ ভবানন্দ মধ্যম হরিবল্লভ কনিষ্ঠ সুবুদ্ধি। ভবানন্দ মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় অতিশয় তেজপুঞ্জ। কিঞ্চিত্ কাল গৌণে ভবানন্দ বিদ্যা অভ্যাস করিতে প্রবর্ত্ত শ্রুতিধর যাহা শুনেন তৎক্ষণেতে তাহাই অভ্যাস হই প্রথম শাস্ত্র পাঠ পশ্চাত্ বাঙ্গালা লিখন পঠন এবং পারসি ও আরবি ইত্যাদিতে বিসারদ হইলেন। অস্ত্র বিদ্যাতে অতি বড় ক্ষমতাপন্ন হয়ারোহণে নলরাজার ন্যায় সর্ব্ব বিদ্যায় বৃহস্পতি তুল্য। রাম সমাদ্দার দেখিলেন পুত্র সর্ব্ব বিদ্যায় অতিশয় গুণবান হইল মনে বিবেচনা করিতেছেন এখন পুত্র রাজধানিতে গমন করে তবে উত্তম হয় কিন্তু পুত্রের বিবাহ অতি ত্বরায় দিতে হইয়াছে ইহাই স্থির করিয়া ভবানন্দের বিবাহ দিলেন। ক্রমে ক্রমে তিন পুত্রের বিবাহ হইল।

ভবানন্দ অন্তঃকরণে নানা প্রকার বিবেচনা করিলেন আমার বাটীতে থাকা পরামর্শ নহে আমি রাজধানিতে গমন করিব। ইহাই স্থির করিয়া পিতাকে কহিলেন পিতা আমি বাটীতে থাকিব না রাজধানিতে গমন করিব। রাম সমাদ্দার কহিলেন উপযুক্ত পরামর্শ করিয়াছ ভাল দিবস স্থির করিয়া যাত্রা কর। পিতার অনুমতি পাইয়া ভবানন্দ কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া দিব্য যানে রাজধানিতে গমন করিলেন। তখন রাজধানি ঢাকায়। ভবানন্দ ঢাকায় উপস্থিত হইয়া উত্তম এক স্থানে রহিলেন এবং সর্ব্বত্রে গমনাগমন করিতে প্রবর্ত্ত বঙ্গাধিকারির নিকটে যাতায়াত করিতে করিতে বঙ্গাধিকারির নিকটে প্রতিপন্ন হইলেন। বঙ্গাধিকারী মহাশয় দেখেন ভবানন্দ অতি বড় গুণবান। অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া আত্ম কার্য্যের মধ্যে প্রধান কার্য্যে ভবানন্দকে নিযুক্ত করিলেন খ্যাতি রাখিলেন রায় মজুমদার। সেই অবধি খ্যাতি হইল ভবানন্দ রায় মজুমদার।

রায় মজুমদারের উন্নতি যথেষ্ট হইল। কিছু কালান্তরে যশহর নগরে প্রতাপাদিত্য নামে রাজা অতিশয় প্রতাপান্বিত হইয়া রাজকর নিবারণ করিলেন। এই সকল বৃত্তান্ত প্রতাপাদিত্য চরিত্রে বিস্তার আছে।

রাজা প্রতাপাদিত্যকে ধরিতে ঢাকার বাদসা রাজা মান সিংহকে আজ্ঞা করিলেন তুমি যাইয়া রাজা প্রতাপাদিত্যকে ধরিয়া আন, তাহাতে রাজা মানসিংহ যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিলেন পশ্চাত্ রাজা মানসিংহ অন্তঃকরণে বিবেচনা করিলেন রাজা প্রতাপাদিত্য বড় দুর্বৃত্ত আমাকে আনিতে সুবা আজ্ঞা করিলেন কিন্তু সেই দেশীয় একজন উপযুক্ত মনুষ্য পাইলে ভাল হয় ইহার পূর্ব্ব ভবানন্দ রায় মাজুমদার রাজা মানসিংহের নিকট যাতায়াত করিতেছেন তাহাতেই রাজা মানসিংহ ভবানন্দ রায় মজুমদারকে জ্ঞাত ছিলেন স্মরণ হইল যে

ভবানন্দ রায় মজুমদার সর্ব্ব শাস্ত্রে পণ্ডিত এবং গৌড় নিবাসী অতএব বঙ্গাধিকারীকে কহিয়া রায় মজুমদারকে লইব ইহার স্থির করিয়া বঙ্গাধিকারীকে রাজা করিলেন তোমার চাকর ভবানন্দ রায় মজুমদারকে আমাকে দেহ আমি সঙ্গে লইয়া যাইব। বঙ্গাধিকারী কহিলেন যে আজ্ঞা কিন্তু বঙ্গাধিকারির যথেষ্ট খেদ হইল যে এমন চাকর আর কখন পাইব না কি করেন রায় মজুমদারকে আহ্বান করিয়া কহিলেন তোমাকে রাজা মানসিংহের সঙ্গে যাইতে হইল। রায় মজুমদার নিবেদন করিলেন, কোন দেশে যাইতে হইবেক তাহাতে বঙ্গাধিকারী কহিলেন গৌড়ে যশহর নগরে রাজা প্রতাপাদিত্য রাজকর রাবণ করিয়াছে তাহাকে ধারতে রাজা মানসিংহ যাইতেছেন তুমিও তাহার সহিত গমন কর যে আজ্ঞা বলিয়া রায় মজুমদার স্বীকার করিলেন। পরে রাজা মানসিংহ ভবানন্দ রায় মজুমদার ও নব লক্ষ সৈন্য সঙ্গে করিয়া প্রতাপাদিত্য নিধন করিতে গৌড়ে প্রস্থান করিয়া দুই মাসে বালুচর গ্রামে উপনিত হইলেন। রায় মজুমদারকে কহিলেন রায় মজুমদার এ স্থানের কি নাম তাহাতে রায় মজুমদারকে নিবেদন করিলেন মহারাজ এ স্থানের নাম বালুচর গঙ্গার তীরেতে গ্রাম পত্তন হইয়াছে। রাজা মানসিংহ কহিলেন অপূর্ব্ব স্থান এই স্থানে রাজধানি হইলে উত্তম হয়। এই কথোপকথনের পর আজ্ঞা করিলেন, আমি কিঞ্চিত্ কাল এখানি বিশ্রাম করিব। রায় মজুমদার সকল মনুষ্যকে কহিলেন তোমরা এই স্থানে বিশ্রাম করহ। কতক কালান্তরে রাজা মানসিংহ রায় মজুমদারকে আজ্ঞা করিলেন, সকল সৈন্যকে সংবাদ করহ কল্য এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব। আজ্ঞানুসারে যাবদীয় সৈন্যকে ভেরীর নাদে জানাইলেন যে, কল্য এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব। পর দিবস সৈন্যের সহিত রাজা মানসিংহ গমন করিলেন।

এক দিবসের পর বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া রাজা মানসিংহ রায় মজুমদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ কোন স্থান। রায় মজুমদার নিবেদন করিলেন মহারাজ এ স্থানের নাম বর্দ্ধমান এ স্থানের অধিপতি রাজা বীরসিংহ ছিলেন এক্ষণে তাহার পুত্র রাজা ধীরসিংহ রাজত্ব করিতেছেন। রাজা ধীরসিংহ শ্রবণ করিলেন যে রাজা মানসিংহ রাজা প্রতাপাদিত্যকে নিপাত করিতে নব লক্ষ দলে আসিয়াছেন। রাজা ধীরসিংহ নিজ পরিবারের উপর আজ্ঞা করিলেন তোমরা সকলে সসজ্জ হও আমি মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব এবং নানা প্রকার সামগ্রী ভেট দিতে হইবেক তাহার আয়োজন করহ রাজা ধীরসিংহ নিজ ভৃত্যেরদিগের প্রতি আজ্ঞা করণে নানা বিধ সামগ্রীর আয়োজন হইয়া প্রস্তুত হইল। পরে রাজা ধীরসিংহ দিব্য যানে আরোহণ করিয়া ভেটের দ্রব্য সকল সঙ্গে করিয়া রাজা মানসিংহের নিকট সাক্ষাত্ করিতে গমন করিলেন। অগ্রে একজন প্রধান চাকর রায় মজুমদারের নিকট যাইয়া নিবেদন করিলেক যে বর্দ্ধমানের রাজা ধীরসিংহ মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন মহারাজার নিকটে আপনি যাইয়া নিবেদন করুণ। পরে রায় মজুমদার রাজা মানসিংহকে নিবেদন করিলেন মহারাজ বর্দ্ধমানের রাজা ধীরসিংহ সাক্ষাত্ করিতে আসিতেছেন। রাজা মানসিংহ কহিলেন আসিতে কহ। পরে রাজা ধীরসিংহ নানা দ্রব্য ভেট দিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন ভেটের দ্রব্য দধি দুগ্ধ ক্ষীর আম্র কাঁঠাল নারিকেল গুবাক শ্রীফল আতা ও আর আর নানা জাতীয় ফল এবং অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব বস্ত্র পট্ট বস্ত্র ও উত্তম সূতার বস্ত্র ও বনাত মখমল এবং চুনি চন্দ্রকান্ত মণি সূর্য্যকান্ত মণি নীলকান্ত মণি অয়স্কান্ত মণি এবং সহস্র সহস্র সুবর্ণ দিলেন। ভেটের দ্রব্য দর্শন করিয়া আর রাজার শিষ্টতা দেখিয়া রাজা মানসিংহ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া রাজা ধীরসিংহকে বসিতে আজ্ঞা করিলেন। রাজা ধীরসিংহ নানা প্রকার শিষ্টাচার করিয়া কহিলেন মহারাজ আমার নগরের ভাগ্যক্রমে এবং আমার অদিষ্ট প্রসন্ন প্রযুক্ত মহারাজার আগমন হইয়াছে। রাজা মানসিংহ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া

রাজা ধীরসিংহকে হস্তি ঘোটক এবং দ্রব্য রাজ বস্ত্র মুক্তার মালা নানা বিধ আভরণ প্রসাদ করিলেন আর কহিলেন আমি তোমার নগর ভ্রমণ করিয়া দেখিব। রাজা ধীরসিংহ নিবেদন করিলেন যে আজ্ঞা। এই সকল কথার পর ধীরসিংহ প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। পরদিবস রাজা মানসিংহ রাজা ধীরসিংহের নগর ভ্রমণ করিতে গমন করিলেন। ভবানন্দ রায় মজুমদারকে সঙ্গে করিয়া রাজা মানসিংহ নগর ভ্রমণ করিতে করিতে দেখেন এক সুরঙ্গ রায় মজুমদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন কিসের সুরঙ্গ। তাহাতে রায় মজুমদার নিবেদন করিলেন বীরসিংহের এক কন্যা বিদ্যা নামে ছিল সে কন্যা সর্ব্ব শাস্ত্রে পণ্ডিতা ইঁহাতেই কন্যা প্রতিজ্ঞা করিলেক যে আমাকে শাস্ত্রের বিচারে পরাভব করিবেক তাহাকে আমি বর মাল্য দিব এই সংবাদ দেশ দেশান্তর প্রচার হওনে অনেক অনেক রাজ পুত্র আসিলেন সকলকে পরাভব করিলেক। পরে দক্ষিণ দেশে কাঞ্চিপুরের গুণসিন্ধু মহারাজার তনয় সুন্দর নামে অতিশয় রূপবান এবং সর্ব্ব শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় এই সকল সংবাদ পাইয়া পিতা মাতাকে না কহিয়া বর্দ্ধমানে হিরা নামে এক মালিনীর বাটীতে বাসা করিয়া রহিলেন সেই সুন্দর সুরঙ্গ কাটিয়া বিদ্যার নিকটে যাইয়া শাস্ত্র বিচারে জয়ী হইয়া বিদ্যাকে গন্ধর্ব্ব বিবাহ করিলেন। ইহার বিস্তার চোর পঞ্চাশতে আছে। রাজা মানসিংহ আজ্ঞা করিলেন সে গ্রন্থ আনিয়া আমাকে শুনাও। রায় মজুমদার চোর পঞ্চাশত শ্লোক আনাইয়া যাবদীয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলেন॥

পশ্চাত্ রাজা মানসিংহ বর্দ্ধমান হইতে গমন করিয়া বিবেচনা করিলেন যে ভবানন্দ রায় মজুমদারের বাটী দেখিয়া যাইব। রাই মজুমদারকে কহিলেন আমি তোমার বাটী দেখিয়া যাইব। রায় মজুমদার যে আজ্ঞা বলিয়া পরম তুষ্ট হইলেন। রাজা মানসিংহ বাগুয়ান পরগণায় উপস্থিত হইয়া ভবানন্দ রায়ের বাটীতে উপনিত হইলেন। রায় মজুমদার নানা জাতীয় ভেটের সামগ্রী রাজার গোচরে আনিলেন। রায় মজুমদারের আহ্লাদ এবং সামগ্রীর আয়োজন দেখিয়া রাজা মানসিংহ অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন। ইতিমধ্যে ঝড় বৃষ্টি অতিশয় উপস্থিত রাজা মানসিংহের সঙ্গে নব লক্ষ সৈন্য খাদ্য সামগ্রীর কারণ মহা ব্যস্ত রায় মজুমদার যাবদীয় সৈন্যের আহার পরগণা হইতে এবং নিজালয় হইতে দিলেন। এই প্রকার সপ্তাহ হাস্ত ঘোটক পদাতিক প্রভৃতি সকলেই কোন ব্যামোহ পাইলেক না। ইহাতে রাজা মানসিংহ ভবানন্দ রায়কে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া রায় মজুমদারকে কহিলেন যদি ঈশ্বর আমাকে জয়ী করিয়া আনেন তবে তোমার উপকারের প্রত্যুপকার করিব। পশ্চাত্ যশোহরে গমন করিয়া রাজা প্রতাপাদিত্যকে শাসিত করিয়া কিছুকাল গৌণে ঢাকায় প্রস্থান করিলেন॥

ভবানন্দ রায় মজুমদার রাজা মানসিংহের সহিত ঢাকায় গমন করিলেন। এক দিবস রাজা মানসিংহ রায় মজুমদারকে কহিলেন তুমি আমার সাহায্য অনেক অনেক করিয়াছ অতএব কোন বাসনা থাকে আমাকে কহ আমি তাহা পূর্ণ করিব। ইহা শুনিয়া রায় মজুমদার নিবেদন করিলেন যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন তবে বাগুয়ান পরগণা আমার জমিদারি আজ্ঞা হয়। রাজা মানসিংহ স্বীকার করিয়া কহিলেন ঢাকায় উপস্থিত হইয়া অগ্রে তোমার বাসনা পূর্ণ করিব। ভবানন্দ রায় মজুমদারের অন্তঃকরণে যথেষ্ট আহ্লাদ হইয়া বিবেচনা করিতেছেন বুঝি কুল লক্ষ্মীর কৃপা হয়।

রাজা মানসিংহ জয়ী হইয়া আসিতেছেন এই সংবাদ বাদসা পাইয়া অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া রাজা মানসিংহকে রাজপ্রসাদ দিবেন তাহার আয়োজন করিতে আজ্ঞা করিলেন প্রধান মন্ত্রীরা সামগ্রী সমাধান করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন।

ভবানন্দ রায় মজুমদারের বাটীতে আশ্চর্য্য এক প্রকরণ হইল. তাহার বৃত্তান্ত এই বড়গাছি নামে এক গ্রাম তাহাতে হরি হোড়ের বসতি। হরি হোড় অতি বড় ধনবান এবং পুণ্যশীল অত্যন্ত ধার্ম্মিক লক্ষ্মী সর্ব্বদা স্থিরা

হইয়া হরি হোড়েব নিবাসে বসতি করেন। বহুকাল এই রূপে গত হইল হরি হোড়ের পরিবার অতি বিস্তব সর্ব্বদা বিবাদ করিতে প্রবর্ত্ত বাটীব মধ্যে হাটেব কোলাহলের ন্যায় লক্ষ্মী বিবেচনা করিলেন এই বাটীতে আব তিষ্ঠান গেল না অতএব আমাব পবম ভক্ত ভবানন্দ মজুমদার তাহাব বাটীতে গমন কবি ইহাই স্থিব কবিয়া হরি হোড়েব বাটী হইতে ভবানন্দ মজুমদারেব বাটীতে চলিলেন। পথেব মধ্যে স্মরণ হইল নদীর নিকট ঈশ্বরী পাটনী আছে সে আমাব অনেক তপস্যা কবিয়াছে তাহাকে সাক্ষাৎ দিয়া বর প্রদান কবিয়া পশ্চাৎ মজুমদারের বাটীতে যাইব। এই চিন্তা করিয়া পরম সুন্দবী এক কন্যা হইলেন কুক্ষি দেশে একটি ঝাঁপী লইয়া নদীর নিকটে যাইয়া কহিলেন ঈশ্বরী পাটনী আমাকে পাব কবিয়া দেহ। ঈশ্বরী পাটনী কহিলেক মা তুমি কে অগ্রে আমাকে কহ পশ্চাত্ পাব কবিব ইহা শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন ঈশ্বরী আমি ভবানন্দ মজুমদারের কন্যা শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলাম সেথানে বিবাদেব জ্বালাতে তিষ্ঠিতে পারিলাম না এখন পিত্রালয়ে যাইতেছি। ইহা শুনিয়া পাটনী কহিলেক মা তুমি মজুমদার মহাশয়েব কন্যা নহ তাহার কন্যা হইলে এই বেশে একাকিনী কেন যাইবা কিন্তু আমার অন্তঃকরণে উদয় হইতেছে তুমি লক্ষ্মী মজুমদারকে হৃতার্থ করিতে গমন কবিয়াছ আমি অতি দুঃখিনী আমাকে আত্ম পরিচয় দিউন। তাহাতে লক্ষ্মী হাস্য করিলেন ঈশ্বরী পাটরী পরম আহ্লাদে নৌকা শীঘ্র আনিয়া কহিলেক মা নৌকায় বৈশ। লক্ষ্মী নৌকায় বসিয়া দুই খানি পদ জলে রাখিলেন। ঈশ্বরী পাটনী কহিলেক মা গো জলে নানা হিংস্রক জন্তু আছে কি জানি পাছি পদে দংশন করে পা দুই খানি তুলিয়া বৈশ। তাহাতে লক্ষ্মী কহিলেন পদ কোথায় রাখিব। ঈশ্বরী পাটনী কহিলেক পা দুই খানি জল সেচনির উপরে রাখ। বিশ্বমাতা ইহা শুনিয়া জল সেচনিতে পদ রাখিলেন জল সেচনিতে পদ স্পর্শ হইতেই সেচনি স্বর্ণ হইল। ঈশ্বরী পাটনী দেখে সেচনি সোনা হইল তখন অন্তঃকবণে বিবেচনা করিলেক ইনি সামান্যা নন জগৎ জননী ছল করিয়া আমার নিকট আসিয়াছেন ঈশ্বরী পাটনা লক্ষ্মীর পদানত হইয়া প্রণাম কবিয়া বহুবিধ স্তব করিলেক তখন লক্ষ্মী হাস্য কবিয়া কহিলেন ঈশ্বরী পাটনী তুমি আমার অনেক তপস্যা কবিয়াছ আমি বড বাধ্য আছি বব যাচ্ঞা কব। ঈশ্বরী পাটনী কহিলেক মা গো তোমাব কৃপায় আমার সকল পূর্ণ হইল যদি বব দিবেন তবে এই বর দেওন যে আমার সন্তান যাবত্ থাকিবেক কেহ দুঃখ না পায় এবং দুগ্ধ ভাত খাউক। তথাস্তু বলিয়া লক্ষ্মী অন্তর্দ্ধান হইলেন।

পশ্চাৎ ঈশ্বরী পাটনী আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া ভবানন্দ মজুমদারেব বাটীতে যাইয়া মজুমদারেব গৃহিণীকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিলেন। মজুমদারেব বনিতা আনন্দার্ণবে মগনা হইয়া ঈশ্বরী পাটনীকে দিব্য বস্ত্র আভরণ সন্তুষ্ট কবিয়া পশ্চাৎ পুরবাসিনীরা সকলে আসিয়া জয় জয় ধ্বনি করিতে প্রবর্ত্ত আহ্লাদেব সীমা নাই। রজনী যোগে ভবানন্দ মজুমদারের স্ত্রী স্বপ্ন দেখেন অপূর্ব্বা এক কন্যা কহিতেছেন আমি তোমার বাটীতে আসিয়াছি এবং আমাব একটি ঝাঁপী তোমার ঘরে রাখিয়াছি তুমি সর্ব্বদা আমার পূজা কবিবা এবং ঝাঁপাটি খুলিবা না। রায় মজুমদারের স্ত্রী প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখেন ঘরেব মধ্য স্থলে ঝাঁপী স্থান করিয়া ঝাঁপী মস্তকে লইয়া অপূর্ব্ব এক স্থানে রাখিয়া নানা বিধ আয়োজন করিয়া লক্ষ্মীর পূজা কবিলেন। অদ্যাপি সেই ঝাঁপী আছে॥

ভবানন্দরায় মজুমদার রাজা মানসিংহের সহিত ঢাকায় উপস্থিত হইলেন। পরে এক দিবস রাজা মানসিংহের সহিত জহানগীরসা বাদসাহের নিকট গমন করিলেন। বাদসাহের নিকট সংবাদ বিস্তারিত রাজা মানসিংহ নিবেদন করিলেন গমন এবং আগমন পর্য্যন্ত কিন্তু ভবানন্দমজুমদারের বিস্তর বিস্তর প্রশংসা বাদশাহের নিকট করণে বাদসা আজ্ঞা করিলেন তাহাকে আমার নিকটে আন। রাজা মানসিংহ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া

আহ্বান করিলেন। রায় মজুমদার বিস্তর বিস্তর নমস্কার করিয়া করপুটে সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বাদসা ভবানন্দ মজুমদারকে দেখিয়া তুষ্ট হইয়া কহিলেন উপযুক্ত মনুষ্য বটে পশ্চাত, মানসিংহকে নানা প্রকার রাজপ্রসাদ সামগ্রী দিয়া আজ্ঞা করিলেন তোমার কোন বাসনা থাকে আমাকে কহ আমি তাহা পূর্ণ করিব। তখন রাজা মানসিংহ নিবেদন করিলেন রাজা প্রতাপাদিত্যকে শাসিত করণের মূল ভবানন্দ মজুমদার যদি আজ্ঞা হয় তবে মজুমদারকে রাজপ্রসাদ কিছু দিউন। বাদসা হাস্য করিয়া কহিলেন উহার নিবেদন কি তখন রাজা মানসিংহ করপুটে কহিলেন বাঙ্গালার মধ্যে বাগুয়ান নামে এক পরগণা আছে সেই পরগণা ইহার জমিদারি হউক। বাদসা হাস্য করিয়া কহিলেন জমিদারির লিপি করিয়া দেহ। আজ্ঞা পাইয়া রাজা মানসিংহ বাগুয়ান পরগণার জমিদারির লিপি বাদসাহের স্বাক্ষর করিয়া মজুমদারকে দিয়া সংভ্রান্ত করিলেন। রায় মজুমদার জমিদারির লিপি লইয়া বাদসাহের নিকট হইতে বিদায় হইয়া রাজা মানসিংহের বাটীতে গেলেন। রাজা মানসিংহ কিঞ্চিৎ গৌণে রাজদরবার হইতে বিদায় হইয়া বাটীতে আসিলেন দেখেন ভবানন্দ মজুমদার বাসয় বসিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি কার্য্যে এখন এখানে আসিয়াছ। তাহাতে মজুমদার কহিলেন মহারাজ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন কিছুকালের জন্যে বিদায় করুন। ইহাতেই রাজা মানসিংহ কহিলেন মজুমদার নিজ বাটীতে যাইবা। মজুমদার নিবেদন করিলেন যেমন আজ্ঞা হয়। রাজা মানসিংহ বহুবিধ রাজপ্রসাদ দিয়া যথেষ্ট তুষ্ট করিয়া মজুমদারকে বাটীতে বিদায় করিলেন।

ভবানন্দ মজুমদার রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া মনের আনন্দে শুভালগ্নে তরণি যোগে বাটী প্রস্থান করিলেন।

ভবানন্দ মজুমদার বাটীর নিকট আসিয়া নিজালয়ে দূত প্রেরণ করিয়া সংবাদ দিয়া পশ্চাৎ আপনি উপস্থিত হইলেন। যাবদীয় লোক শ্রবণ করিলেন যে রায় মজুমদার বাগুয়ান পরগণা জমিদারি করিয়া আসিয়াছেন ইহাতে যাবদীয় মনুষ্য হর্ষ হইয়া ভেটের সামগ্রী লইয়া সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেক সকলের মহা আনন্দ হইল। রায় মজুমদার যে যেমন মনুষ্য তাহাকে তেমনি সমাদর করিয়া শিষ্টাচার করিলেন এবং প্রজারদিগকে যথেষ্ট আশ্বাস করিয়া সকল মনুষ্যকে জমিদারির পত্র দেখাইলেন পশ্চাৎ আত্ম গৃহে গমন করিয়া পুর মধ্যে উত্তম স্থানে কিঞ্চিৎকাল বসিয়া অন্তঃপুরে গমন করিয়া মধুর বাক্যে নিজ পরিবারের তোষ জন্মাইয়া দিব্য আসনে বসিলেন। রায় মজুমদারের পত্নী লক্ষ্মীর আগমনের যাবদীয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। সকল সমাচার জ্ঞাত হইয়া রায় মজুমদার বিবেচনা করিলেন লক্ষ্মীর কৃপায় আমার সকল সম্পত্তি মহানন্দে গাত্রোত্থান করিয়া ঝাঁপী দর্শন করিয়া প্রণামানন্তর বহুবিধ স্তব করিলেন এবং সহস্র মুদ্রা ব্যায় করিয়া জ্ঞাতি কুটুম্ব নিমন্ত্রণ করিয়া লক্ষ্মীর পূজা করিলেন এবং রাজকীয় ব্যাপার করিতে প্রবর্ত্ত সকল প্রজা মনের হর্ষে রাজকর যোগাইতে লাগিল। কিছু কালানন্তরে ভবানন্দ রায় মজুমদারের তিন পুত্র হইল জ্যেষ্ঠের নাম রাখিলেন গোপাল মধ্যমের নাম গোবিন্দ কণিষ্ঠের নাম শ্রীকৃষ্ণ। ইহাদিগের মধ্যে গোপাল রায় সর্ব্ব শাস্ত্রে উত্তম পণ্ডিত। কতক কালানন্তরে রায় মজুমদার তিন পুত্রের বিবাহ দিলেন। কালক্রমে গোপাল রায়ের পুত্র হইল নাম রাখিলেন রাঘব রায়। ভবানন্দ রায় পৌত্র দর্শন করিয়া বিবেচনা করিলেন এ পৌত্র অতি প্রধান মনুষ্য হইবেক, সর্ব্ব লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত। পৌত্রোত্সবে মহতী ঘটা করিয়া পশ্চাৎ ভ্রাতা সুবুদ্ধি রায় ও হরিভল্লব রায়কে কিঞ্চিৎ জমিদারি দিয়া সংসার হইতে বিরত হইলেন। পরে গোপাল রায় সর্ব্বাধ্যক্ষ হইয়া কাল যাপন করেন। কিছু কাল পরে গোপাল রায় ভ্রাতা গোবিন্দ রায় ও ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ রায়কে কিঞ্চিৎ জমিদারি দিয়া ঈশ্বর ভজন কারণ বিষয়ত্যাগী হইলেন। পরে রাঘব রায় সর্ব্ব শাস্ত্রে গুণবান অতি বড় দাতা সর্ব্বদা যাবদীয় প্রজার প্রতিপালনে মতিমান সর্ব্ব লক্ষণাক্রান্ত দান ধ্যান যোগ সদালাপ বিশিষ্ট লোকের সমাদর রাজ্য

সুদ্ধ সকল লোকের নিকট মহৎ সুখ্যাত্যাপন্ন জমিদারির বাহুল্য হইলে লাগিল। মনে মনে বিচার করিয়া স্থির করিলেন আমি রাজধানিতে গমন করিব। শুভ দিন স্থির করিয়া রাজধানিতে গমন করিলেন। সম্রাটের রাজার সহিত সাক্ষাত্ করিয়া আত্মমানের গৌরব যথেষ্ট জন্মাইলেন। সম্রাটের রাজা রাঘব রায়ের সহিত আলাপ করিয়া দেখিলেন এ বড় মনুষ্য ইহাকে রাজা করি। পরে অনেক ভূমির কর্ত্তা করিয়া রাজপ্রসাদ দিয়া উপাধি রাখিলেন রাঘব রায় মহারাজ সেই অবধি খ্যাতি হইল মহারাজ। পরে মহারাজ আত্ম রাজধানিতে আগমন করিয়া রাজত্বের বাহুল্য করিয়া কাল জাপন করেন। সময় ক্রমে এক পুত্র হইল যাহার নাম রাখিলেন রুদ্র রায়। পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ কালানন্তরে রুদ্র রায়কে রাজ্য দিয়া ঈশ্বরে মনোর্পণ করিলেন।

রুদ্র রায় মহারাজ রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া মহানন্দে কালজাপন করেন। এক দিবস পাত্র মিত্র সকলকে আজ্ঞা করিলেন যে তোমরা সকলে মাটীয়ারি পরগণায় যাইয়া অপূর্ব্বা এক পুরী প্রস্তুতা করহ আমি সেই স্থানে বাস করিব। সকলেই কহিলেন উপযুক্ত স্থান বটে। এই পরামর্শ স্থির করিয়া প্রধান প্রধান চাকর অগ্রে গমন করিয়া বাটী নির্ম্মাণ করিলেন। পরে রুদ্র রায় মহা রাজ সপরিবারে মাটীয়ারির বাটী যাইয়া বসতি করিলেন। অদ্যাপি এ সকল স্থান বর্ত্তমান আছে। পরে সময় ক্রমে রুদ্র রায় মহারাজার তিন পুত্র হইল জ্যেষ্ঠের নাম রামচন্দ্র মধ্যম রামকৃষ্ণ কনিষ্ঠ রামজীবন। রামচন্দ্র মহারাজ অতি বড় বলবান রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া বলক্রমে অনেক ক্ষুদ্র জমিদারের ভূমি লইয়া আপন রাজ্য অধিক করিলেন। রামচন্দ্র মহারাজ অবর্ত্তমানে রামকৃষ্ণ রাজা হইলেন। এই কালীন ঢাকায় সুবা হইলেন মুরসদালি খান ইতি ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া আত্ম নামে এক অপূর্ব্ব নগর বসাইয়া নাম রাখিলেন মুরসদাবাদ এই নগরে রাজধানি করিলেন। রামকৃষ্ণ মহারাজ পরম ধার্ম্মিক এবং সুবার নিকট যথেষ্ট মর্য্যাদান্বিত যে রাজকর পূর্ব্বে নিয়মিত ছিল তাহা অপেক্ষা কিছু অল্প করিয়া যথেষ্ট সৈন্য রাখিয়া রাজ্যের বাহুল্য করিলেন। রামকৃষ্ণ মহারাজ বাইশ লক্ষের জমিদারি করিয়া পরম সুখে কালজাপন করেন। তাহার অবর্ত্তমানে রামজীবন রায় রাজা হইলেন।

রামজীবন রায় মহারাজ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া রাজা রামকৃষ্ণ কৃষ্ণনগর নামে যে এক নগর করিয়াছিলেন, সেই স্থানে রাজধানি করিলেন। রামজীবন রায় মহারাজ অত্যন্ত প্রতাপান্বিত রাজ্য অতিশয় শাসিত করিয়া এইরূপে কালক্ষেপণ করেন। সময় ক্রমে মহারাজার দুই পুত্র হইল। জ্যেষ্ঠ রঘুরাম কনিষ্ঠ রামগোপাল। কিছু কালানন্তরে রঘুরাম রায় রাজা হইলেন। রঘুরাম রায় মহারাজ অতি বড় দাতা পুণ্যবান পরম সুখে কালজাপন করেন? রাজা রাণীর অধিক বয়ঃক্রম হইল পুত্র না হওয়াতে সর্ব্বদা ক্ষোদিত থাকেন। এক দিবস ঈশ্বরের আরাধনা ব্যাতিরেকে উত্তম রত্ন লাভ হয় না অতএব আমরা দুই জনে কঠোর তপস্যা করি তবে ঈশ্বর অবশ্য পুত্র দিবেন। রাজা রাণী ইহাই স্থির করিয়া আরাধনার নিয়ম করিলেন। অতি প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া স্নানান্তর ঈশ্বরের মহতী পূজা করিয়া সূর্য্যদৃষ্টি করিয়া রাজা রাণী প্রত্যেহ ঈশ্বরের তপস্যা করেন। এইরূপে এক বৎসর গত হইল রাজা রাণীর তপস্যাতে সকল লোকের চমৎকার বোধ হইয়া বিস্তর বিস্তর প্রশংসা করিলেক। আরাধনার নিয়ম এক বৎসর তাহা পূর্ণ হইলে মহামতী করিয়া যজ্ঞ করিলেন। কিঞ্চিত্ কাল পরে দিবস রাত্রে রাজা রঘুরাম রাণীর সহিত অন্তঃপুরে শয়ন করিয়াছেন, রজনী শেষে রাণী অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিয়া চৈতন্য হইয়া রাজাকে গাত্রোত্থান করাইলেন রাজার চৈতন্য হইলে পরে নিবেদন করিবেন হে মহারাজ আমি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলাম। রাজা কহিলেন কি স্বপ্ন দেখিয়াছ। রাণী কহিলেন আমি নিদ্রায় ছিলাম একজন অপূর্ব্ব পুরুষ আসিয়া আমাকে কহিলেন আমি তোমার পুত্র হইব আমা হইতে তোমরা অনেক সুখী হইবা এবং যাবদীয় লোক

তোমাকে স্থবর্ণগর্ত্তা কহিবেক যেহেতু আমাকে প্রসব হইবা আমি কহিলাম আপনিকে তাহাতে কহিলেন তোমরা যাহার আরাধনা করিয়াছিলা আমি তাহার অন্তর্গৃহিত তোমার পুত্র হইতে আমাকে আজ্ঞা হইয়াছে ইহা বলিয়া অতিক্ষুদ্র মূর্ত্তি ধারা করিয়া আমার মুখ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজা রঘুরাম রায় স্বপ্নের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহী আনন্দার্ণবে মগ্ন হইয়া রাণীকে কহিলেন তোমার অপূর্ব্ব বালক হইবেক অদ্য তোমার গর্ভাধান হইল এই কথা অন্যকে কহিবা না। কিঞ্চিৎ কাল পরে রাণীর গর্ভ প্রচার হওনে পাত্র মিত্র আত্মীয়বর্গের সমূহ আনন্দ হইল দিনে দিনে নানা প্রকার উৎসাহ হইতেছে। সময় ক্রমে রাণীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল এই সম্বাদ রাজা শুনিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্র মহামহোপাধ্যায় এমত পণ্ডিতগণকে লইয়া রাজা অন্তঃপুরের নিকটে বসিলেন যাবদীয় প্রধান প্রধান ভৃত্যেরা সদা সাবধানে আছে যখন যাহাকে যে আজ্ঞা হবেক তৎক্ষণেতে সে কার্য্য করিবেক ইতি মধ্যে শুভক্ষণে শুভ লগ্নে অপূর্ব্ব এক পুত্র হইল। পুত্রের রূপে পুরী চন্দ্রের ন্যায় আলো করিল। রাজপুরে জয় জয় ধ্বনি হইবা মাত্র অট্টালিকার উপরে বাদ্যোদ্যম শঙ্খ ঘণ্টা র্ঝাঁড় তুরী ভেরী ঝাঁঝরী রাম সিঙ্গা ঢক্কা ঢোল দামামা এবং বীণা মৃদঙ্গ কাংস্য করতাল রামবেণী প্রভৃতি নানা যন্ত্রের বাদ্যে কোলাহল শব্দ নগরস্থ রমণীরা রাজপুরে আসিয়া হুলু হুলু ধ্বনি করিতে প্রবর্ত্ত হইল। রাজা পরমাহ্লাদে শত শত স্থবর্ণ এক এক ব্রাহ্মণকে এবং উদাসীনকে ও অন্ধ অতুরে এবং খঞ্জকে প্রদান করিতে লাগিলেন। যাবদীয় নগরস্থ লোকদিগের সন্তোষের সীমা নাই। কিঞ্চিৎ কাল পরে পাত্রের প্রতি রাজা আজ্ঞা করিলেন যাবদীয় নগরের লোকের বাটীতে মৎস্য ও দধি এবং সন্দেশ ভারে ভারে প্রদান কর। পাত্র রাজাজ্ঞানুসারে সকলের বাটীতে প্রদান করিয়া পশ্চাৎ রাজার নিকট গমন করিয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ অন্তঃপুরে যাইয়া পুত্র দর্শন করুন এবং ভৃত্যবর্গের দিগেরও বাসনা রাজপুত্র দেখে। রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন কর্ত্তব্য বটে রাজা অগ্রে পুরমধ্যে গমন করিয়া পুত্র দর্শন করিলেন পশ্চাৎ দাসীরদিগের প্রতি আজ্ঞা করিলেন পাত্র প্রভৃতি যাবদীয় ভৃত্যেরা রাজপুত্র দর্শন করিতে আসিতেছে সকলকে দেখাও। দাসীরা রাজপুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া যাবদীয় প্রধান প্রধান ভৃত্যেরদিগকে দেখাইল পরে সকলেই অন্তঃপুর হইতে আগমন করিয়া রাজ সভাতে বসিলেন সমস্ত ব্রাহ্মণেরা বেদধ্বনি করিতে লাগিলেন পরে জ্যোতিষ ভট্টাচার্য্যেরা নানা শাস্ত্র বিচার করিয়া দেখিলেন অপূর্ব্ব বালক হইয়াছে। রাজার নিকটে নিবেদন করিলেন মহারাজ এই যে রাজপুত্র হইয়াছেন ইহার দীর্ঘ পরমায়ু হইবেক সর্ব্ব শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় এবং বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় এবং ধর্ম্মাত্মা হইবেন সকল লোক ইহার অতিশয় যশ ঘুষিবেক মহারাজ চক্রবর্ত্তী হইয়া বহুকাল রাজ্য করিবেন মহারাজ ইহার গুণে কুল উজ্জ্বল হইবেক। রাজা জ্যোতিষি ভট্টাচার্য্যেরদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হর্ষ যুক্ত হইলেন। কিছু কালানন্তরে নর্ত্তকীরা আসিয়া রজনীতে রাজার সম্মুখে নৃত্য করিতে প্রবর্ত্ত হইল দিবা রাত্রি সর্ব্বদাই নগরস্থ লোকেরদিগের আনন্দের সীমা নাই। এইরূপে কাল ক্ষেপণ করে রাজপুত্র দিনে দিনে চন্দ্রের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছেন নাম রাখিলেন কৃষ্ণচন্দ্র কালক্রমে বিদ্যা অভ্যাস করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন শ্রুতিধর যখন যাহা শুনেন তৎক্ষণাৎ অভ্যাস হয় সকল শাস্ত্রেই পণ্ডিত হইলেন। পরে বাঙ্গালা ও ফারসি শাস্ত্রেও পণ্ডিত হইয়া অস্ত্র বিদ্যাতে প্রবর্ত্ত হইয়া অল্প দিনেই শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া রাজকীয় ব্যাপার শিক্ষা করিতে লাগিলেন রাজারদিগের যেমন নীতি বর্ত্ম আছে তাহা শিক্ষা করিলেন অল্প কালের মধ্যে সকল বিষয়ের পারগ হইলেন।

উৎকল-দুর্ভিক্ষ।

স্বদেশ আমাদের জীবনের সুখ-স্বপ্ন—এই স্বদেশের সেবা একমাত্র জীবনের ব্রত। কিন্তু বার্দ্ধক্যের তাড়নায় বুঝিবা জীবনের ব্রত প্রতিপালিত হয় না। শরীর ক্রমেই অপটু হইতেছে, এই মনোদুঃখে বড়ই অস্থির আছি। বিধাতা সহায় হউন।

এবার চতুর্দ্দিকে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেশকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। এই দারুণ দুর্দ্দিনে মাতৃভক্ত সন্তানগণ ব্রত গ্রহণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া সুখী হইতেছি। শ্রীযুক্ত লাজপত রায়, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল নিয়োগী, শ্রীযুক্তা মিস্ গিলবার্ট, অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের ভ্রাতৃগণ এবার সেবা-ব্রতে প্রবৃত্ত হওয়ায় দেশের ঘোরতর দুর্দ্দিনে আশার স্বপ্ন দেখা যাইতেছে। সেবার ন্যায় ধর্ম্ম নাই। পৃথিবীতে কোন সৎ কাজে টাকার অভাব হয় না,—এ দেশেও কখনও হয় নাই। সেবকের অভাবই এদেশের প্রধান অভাব ছিল। এবার এত লোক কার্য্য-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন, দেখিয়া বড়ই আশান্বিত হইয়াছি। আশা করি, এদেশে প্রকৃত সেবকের দল দিন দিন বর্দ্ধিত হইবে এবং দেশের দুর্দ্দিন ঘুচিবে।

জোরহাট বঙ্গবান্ধব সমিতির সভ্যগণ উৎকল দুর্ভিক্ষের সাহায্যের জন্য আমাদের হস্তে ৫০৲ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। এই টাকা এবং নিজ তহবিল হইতে কতক টাকা লইয়া ২৯শে বৈশাখ (১৩১৫) কটক যাত্রা করি। আল (Aul) থানায় থাকিয়া মাতৃভক্ত সাধু শ্রীযুক্ত শশীভূষণ রায় চৌধুরী সেবা-কার্য্য করিতেছিলেন। টাকা নিঃশেষ হওয়ায় তিনি কার্য্যস্থল পরিত্যাগ করিয়া এই সময়ে কটকে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কটকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। সেবিকা শ্রীযুক্তা মিস্ গিলবার্টও, জেনাপুর—মধুপুরের সেবার কার্য্য সেই স্থানের রাজা গ্রহণ করায়, এই সময়ে কটকে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার সহিতও কটকে সাক্ষাৎ হয়। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত কণিকার রাজা বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবগত হই যে, রাজনগর থানায় কোন দান-সাহায্য প্রদত্ত হইতেছে না। এজন্য আমরা সকলে তাঁহার এলাকায় রাজনগর গমন করিব, এইরূপ প্রস্তাব স্থির হয়। ২রা জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার আমরা কেন্দ্রাপাড়া কেনাল-ষ্টিমারে যাত্রা করিব, স্থির হয়। এই দিনের ষ্টিমারই শেষ ষ্টিমার, খাল পরিষ্কৃত করিবার জন্য, ইহার পর, একমাস ষ্টিমার-চলাচল বন্ধ থাকিবে। আমি যথাসময়ে জোব্রা ষ্টিমার ঘাটে পৌঁছিলাম। জোব্রার সব-এজেণ্ট শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের সহৃদয় ব্যবহার জীবনে ভুলিবার নয়। ষ্টিমার ছাড়ার সময় শ্রীযুক্ত শশী বাবু, উৎকলের সেবক শ্রীমান্ রঘুনাথ মহাপাত্রকে লইয়া পৌঁছিলেন। কণিকার রাজা একজন পেয়াদা পাঠাইলেন। কিন্তু মিস্ গিলবার্ট যথা সময়ে পৌঁছিতে পারিলেন না। এজন্য তিনি যে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, ভাষায় তাহা ব্যক্ত হয় না। আমাদিগের ইচ্ছা ছিল, রাজনগর থানার গ্রাম সকল আমরা পরিদর্শন করিব, আল (Aul) থানায় শ্রীযুক্তা মিস্ গিলবার্ট থাকিবেন। রাজনগর দেখিয়া আমরা চাঁদবালী হইয়া বিঞ্ঝারপুর, জাজপুর, জেনাপুর যাইব, বাসনা ছিল। ঘটনাচক্রে তাহা হইল না। আমরা ৩রা জ্যৈষ্ঠ, শনিবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে কেরাবাগড়ে পৌঁছিলাম। সেদিন কেরাবাগড়ের হাট ছিল। হাটে অনেক জীর্ণ শীর্ণ বালক দেখিলাম। তাহাতেই বুঝিলাম, স্থানের অবস্থা ভাল নয়। রাজার বাঙ্গালায় যাইয়া দেখিলাম, রাজার টেলিগ্রাম পাইয়া শ্রীযুক্ত ইন্দ্রমণি মাহান্তি মহাশয় রাজকণিকা হইতে

আমাদিগকে গ্রহণ করিতে উপস্থিত হইয়াছেন। রাজার সহৃদয় ব্যবহার জীবনে ভুলিবার নয়। ইন্দ্রমণি বাবু প্রথমে বলিয়াছিলেন যে, রাজনগর থানায় দুর্ভিক্ষ নাই। কিন্তু রাত্রে রাজনগরের তহশিলদার শ্রীযুক্ত বাণাম্বর মাহান্তি মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া বলিলেন যে, "গ্রাম সকল পরিদর্শন করুন,—অনেক অভাবগ্রস্ত লোক আছে।" আমরা পরদিন প্রত্যূষে তিন বন্ধু মিলিয়া গ্রামের অবস্থা দেখিতে বহির্গত হইলাম। শ্রীযুক্ত তহশীলদার-বাবুও সঙ্গে গিয়াছিলেন। তহশিলদার বাবু এক আশ্চর্য্য প্রকৃতির লোক;—তিনি দরিদ্রের বন্ধু এবং রাজার হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি। সে দিন ১৪ মাইল পরিভ্রমণ করিয়া আমরা অপরাহ্ণে ৩ টার সময় প্রত্যাগত হই। দেখিলাম, বহু গ্রামের বহু লোক কেবল "মুটি" নামক শাক খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। মাঠে উৎপন্ন এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা-বিশিষ্ট শাকের নাম "মুটি শাক"। বহু গ্রামের বহু বাড়ী পরিদর্শন করিয়া দেখিয়াছি—অনেক গৃহে কোন আসবাব নাই, কেবল দুই একটী মৃণ্ময় হাঁড়ি আছে,—আর সকল ঘরেই কেবল সংগৃহীত "মুটিশাক।" কোন ঘরে এক মুষ্টি তণ্ডুল বা ক্ষুদ দেখি নাই। আমরা অবস্থা বিবেচনায় সর্ব্বত্রই আট আনা, এক টাকা, দুই টাকা সাহায্য প্রদান করিয়াছিলাম। অপরাহ্ণে কেরারাগড়ে বহুলোককে তণ্ডুল দিয়াছিলাম। পরদিন আবার গ্রাম পরিদর্শনে যাত্রা করি। সেদিনও, পূর্ব্ব দিনের ন্যায়, অবস্থা বিবেচনায় কিছু কিছু দিয়াছিলাম। পরদিন আমরা গ্রাম পরিদর্শন করিতে করিতে রাজনগর যাই। ভাটপাড়ার শ্রীযুক্ত চিন্তামণি সামন্তরাও,আমাদিগের জন্য অনেক দ্রব্য লইয়া, অপরাহ্ণে, রাজনগর ডাক-বাঙ্গালায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার দয়া এবং সহৃদয়তা অনুকরণ-যোগ্য। আমরা শ্রীযুক্ত বাণাম্বর বাবুর অতুল স্নেহে রাজনগর ডাক-বাঙ্গালায় আশ্রয় পাইয়াছিলাম। কিন্তু অপরাহ্ণে ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয় ডাকবাঙ্গালা অধিকার করিলে আমরা এক প্রকার বিতাড়িত হই। সে সকল অপ্রিয় কথা এবং স্বদেশী বন্ধুর নির্ম্মম ব্যবহার এখানে লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি না। আমরা ৩ বন্ধু নিরুপায় হইয়া, রাজকাছারীর সংলগ্ন একটী সংকীর্ণ বারেন্দায় রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। রাত্রে কিঞ্চিৎ জলযোগ ভিন্ন আর কিছু জুটিল না। কি কারণে জানিনা, শশী বাবু রাত্রে একটু অসুস্থ হইলেন। আমি ও রঘুনাথ পরদিন প্রত্যূষে এই থানার অবশিষ্ট গ্রাম পরিদর্শনে বাহির হইলাম। এই দিন রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত ২৬ মাইল পথ পরিভ্রমণ করিয়া সাহায্য প্রদান করা হইয়াছিল। রাজনগরের শেষ সীমায় বঙ্গোপসাগর-কূলে হাতিমা গ্রাম। এ দিন সাগর পর্য্যন্ত যাওয়া হইয়াছিল এবং সমস্ত গ্রামে সাহায্য প্রদান করা হইয়াছিল। তৎপর দিন রাজনগরের আর কয়েকটী বাকী গ্রাম পরিদর্শন করিয়া সাহায্য প্রদান করা হয়। তৎপর আবার কেরারাগড়ে প্রত্যাগত হই। রাজনগর থানার কাজ শেষ করিয়া আমরা ১০ মাইল হাঁটিয়া বিবরণ সংগ্রহ করিতেই আল-থানায় গমন করি। "আল" খরস্রোতা নদীর কূলে অবস্থিত। আল-থানার সবইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত কেদারনাথ নিয়োগী মহাশয় আমাদিগকে একটু স্থান না দিলে বড় কষ্টে পড়িতে হইত। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, সবডেপুটী মহাশয়, আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিবেন, কটকে ক্ষীরোদ বাবু বলিয়াছিলেন,কিন্তু সাহায্য দূরে থাকুক, তিনি ভাল করিয়া আমাদের সহিত কথাও বলিলেন না। উৎকল-দীপিকায় তাঁহাদের কার্য্য সম্বন্ধে কে কি নাকি লিখিয়াছিল, তাহাতে বিরক্ত হইয়াই এরূপ নির্ম্মম ব্যবহার করিলেন! ঘটনা পরম্পরায় বুঝিয়াছিলাম, সব-ইনস্পেক্টর বাবু আমাদিগকে স্থান না দেন, সে জন্যও তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন! আমরা আল থানার অনেক স্থান পরিদর্শন করিয়া ৮।৯ মাইল হাঁটিয়া রাজকণিকায় যাই। রাজ-কণিকাকে রাজা অপূর্ব্বসাজে সজ্জিত করিতেছেন; তাহার একদিকে খরস্রোতার একটী শাখা নদী ও অন্য দিকে বৈতরণী নদী। সেখানে যাইয়া শুনিলাম, ম্যানেজার ক্ষিতীশ বাবু বালেশ্বর গিয়াছেন, ইন্দ্রমণি বাবু তখনও

রাজনগর হইতে প্রত্যাগত হন নাই। আমরা অগত্যা চাঁদবালীতে যাইয়া এক মুদীর দোকানে আশ্রয় লইলাম। আমার হাতের টাকা নিঃশেষ হওয়ায়, কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়কে কিছু টাকা পাঠাইয়া দিতে লিখিয়াছিলাম। দুই দিন চাঁদবালীতে অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু টাকা পৌঁছিল না। শুনিয়াছি, আমরা স্থানান্তরে যাওয়ার পর টেলি-মানিতে এক শত টাকা প্রেরিত হইয়াছিল ও তাহা ফেরত গিয়াছিল। চাঁদবালী হইতে বিষ্ণুপুর যাওয়ার জন্য চেষ্টা করিলাম, কিন্তু উপায় করিতে পারিলাম না। শশী বাবুর সহিত একটী বড় বাক্স ছিল, তাহা মুটে ভিন্ন স্থানান্তরিত করার উপায় ছিল না। খুব বাতাস উঠিয়াছিল, নৌকারও সুবিধা হইল না। ভদ্রকে যাওয়ার গরুর গাড়ীও পাওয়া দুষ্কর। কেনেল ষ্টিমার বন্ধ—কটকে ফিরিবারও উপায় নাই। দুই দিন চেষ্টার পর ভদ্রক যাওয়ার জন্য দুই খানি গরুর গাড়ী পাওয়া গেল। আমরা অতি কষ্টে গ্রামের বিবরণ সংগ্রহ করিতে করিতে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। ডোলসাহাতে সেটেলমেণ্ট অফিসার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আমাদিগের প্রতি বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আমরা অতি কষ্টে ভদ্রক পৌঁছি। সেখান হইতে শশীবাবু মেদিনীপুর গমন করেন, রঘুনাথ ভুবনেশ্বরে এবং আমি পুরী হইয়া শ্রান্ত ও ক্লান্ত দেহে কলিকাতায় প্রত্যাগত হই। কলিকাতায় পৌঁছিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়কে এবং তৎপর শ্রীযুক্ত কণিকার রাজা বাহাদুরকে পত্র লিখিয়া সবিশেষ অবগত করি। রাজা বাহাদুরকে লিখিয়াছিলাম যে, যদি তিনি রাজনগরের প্রজাদিগের জন্য চেষ্টা করেন, তবে বড় সুখের বিষয় হয়, যদি চেষ্টা না করেন এবং যদি দয়া করিয়া আমাদিগকে একটু আশ্রয় স্থান দেন, তবে আমরা যাইয়া রীতিমত কার্য্য আরম্ভ করিব; কিন্তু তাহাতে তাঁহার দুর্নাম হইবে। পুনঃ যাওয়ার জন্য সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলাম কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত রাজা বাহাদুর পত্রের কোন উত্তর দেন নাই। রাজা স্থান না দিলে রাজনগরে কাজ করিবার আর আশ্রয় পাওয়ার উপায় নাই। কলিকাতা পৌঁছার কয়েকদিন পরেই আমার বাম-পায়ে একটী কারবঙ্কাল হয়। এক মাসের অধিক ভুগিয়া এখন আরোগ্য হইয়াছি।

আমরা উড়িষ্যার নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বুঝিয়াছি, উড়িষ্যার মত দরিদ্র স্থান ভারতে আর নাই। আমরা ১৯৫ গ্রামের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি এবং প্রায় দুই সহস্র লোককে সাহায্য দিয়াছি। জোবহাটের ৫০ বাদে আর সমস্তই নিজে দিয়াছি বলিয়া টাকার কথা উল্লেখ করিলাম না। আমরা জানিয়াছি, অনেক লোক ওলাউঠায় মরিতেছে, তাহার কারণ আর কিছুই নয়,—অখাদ্য ভক্ষণই তাহার কারণ। রাজনগরের অধিকাংশ স্থলে কেবল একফসল অর্থাৎ ধান্য উৎপন্ন হয়, কখনও ব্রাহ্মণী ও খরস্রোতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্লাবনে তাহা নষ্ট হয়, কখনও সমুদ্রের লোনা জলের প্লাবনে নষ্ট হয়। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী অধিকাংশ গ্রামে দুই চারিটী অশ্বত্থ ও দুই চারিটী গলাগাছ ভিন্ন আর কোন গাছ দেখা যায় না। কোন ফল খাইয়া যে লোকেরা প্রাণ ধারণ করিবে, সে সম্ভাবনাও নাই, কেবল শাক আর শাক,—কেবল মুটি শাক; জমী চাষ হওয়ায় তাহাও নির্ম্মূল হইতেছে। বাঁধ মেরামতের কাজ হইতেছে বটে, কিন্তু সমস্ত দিনে কেবল ৵১০ মেলে। হায়, উদর পুরিয়া না খাইতে পাইলে কি মাটী কাটা যায়? অনেক লোক কাঁদিয়া বলিয়াছে, "বাবু, এই জীর্ণ শীর্ণ শরীরে অনাহারে থাকিয়া কিরূপে মাটী কাটিতে পারি?" বাণেশ্বর বাবু দেবতার ন্যায় লোক—সপ্তাহে ২ দিন ১৫০ কি ২০০ লোককে রাজ-ষ্টেট হইতে কিছু কিছু চাউল দিতেছেন বটে, কিন্তু তাহাতে কিছুই হইতেছে না। এক রাজনগর থানায় চারি হইতে পাঁচ হাজার লোককে সাহায্য প্রদান করা উচিত; কিন্তু একেত্রে কে অগ্রসর হইবে? আশ্রয়ই বা কে দিবে?

রাজনগর থানায় এমন কোন স্থান নাই, যেখানে আশ্রয় পাওয়া যাইতে পারে। সামান্য ঘরে লোকেরা বাস করে, ধনী-লোক নাই বলিলেই হয়। ভাটপাড়ার চিন্তামণি বাবুর অবস্থা একটু ভাল, কিন্তু তাঁহার বাড়ীতেও অন্যকে আশ্রয় দিবার ঘর নাই। কণিকার রাজকাছারীতেও আশ্রয় পাওয়ার স্থান নাই, আশ্রয় কেবল কেরাবাগড় ও রাজনগরের ডাক বাঙ্গালায় পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু রাজা বাহাদুর সেখানে আশ্রয় না দিলে আর উপায় নাই। কি জানি কেন, তিনি পত্রের উত্তর দিলেন না। তিনি বুদ্ধিমান লোক—এ ব্যবহার তাঁহার অযোগ্য। ঐ ডাক-বাঙ্গলা দুইটী তাঁহার। সেখানেও গবর্ণ-মেণ্টের লোকেরও ঐ ভাব। স্বদেশী লোকই হউক বা সাহেবই হউক—গবর্ণমেণ্টের বা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কর্ম্মচারীগণ প্রায়ই এক অবস্থা-পন্ন—তাঁহারা আর কাহাকেও মানুষ বলিয়া গণ্য করেন না। এই অবস্থায়—রাজার সহানুভূতি ভিন্ন সেখানে কার্য্য করিবার আর উপায় নাই। পূর্ব্ব বাঙ্গালার অনেক স্থলে নৌকায় বাস করা যায়, পশ্চিম বাঙ্গালার অনেক স্থলে হাট বাজারে ঘর পাওয়া যায়, কিন্তু উৎকলে সে সুবিধাও নাই। দারিদ্র-তার দারুণ নিষ্পেষণে সকলে অবসন্ন এবং ম্রিয়মান। অতিরিক্ত খাজনার দায়, জল-সিঞ্চনের করের দায় এবং আরো বহু প্রকার করের দায়ে তাহারা অস্থির। জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালময় মূর্ত্তি দেখিলে পাষাণও ফাটিয়া যায়। দলে দলে শিশুসহ কঙ্কালময় স্ত্রীলোকেরা চাঁদবালীতে হাঁড়ি হাতে করিয়া ভাতের মাড়ের জন্য ঘুরিতেছে, দেখিলে পাষাণও ফাটিয়া যায়। পরিত্যক্ত আম্রের আঠী তুলিয়া চুষিতেছে, দেখিলে কে স্থির থাকিতে পারে? দুই তিন মাইল দূরে "মুটিশাক" তুলিতে যাইতেছে, দেখিলে কে ঠিক থাকিতে পারে? কোন গ্রামে ভিক্ষাও মিলে না। কাহারও অবস্থা এমন নাই যে, এক মুষ্ট চাউল দিতে পারে, যেন সকলেই এক অবস্থাপন্ন। আমরা এক দিন ১২ মাইলের মধ্যে একবিন্দু জল পাই নাই। বাঙ্গালার জলকষ্টের কথা অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু রাজ-নগর যে জল-কষ্ট দেখিয়াছি, কেহ তাহা কল্পনাও করিতে পারিবেন না। নদী ও সমুদ্রের জল লবণাক্ত—আর জল নাই;—দুই এক গ্রামে দুই একটা শুষ্ক পুকুর দেখি-য়াছি মাত্র। সামান্য কুয়ার কর্দ্দমাক্ত জলে অসংখ্য অসংখ্য লোক প্রাণ ধারণ করিতেছে, এ চিত্র দেখিলে কে ঠিক থাকিতে পারে? হায় উৎকল, তোমার ন্যায় দরিদ্র দেশ, বোধ হয়, পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। এইরূপ অবস্থা, কিন্তু কটকের শ্রীযুক্ত গোপবন্ধু বাবু ভিন্ন আর কোন সহৃদয় লোক দেখি নাই, যিনি একবিন্দু চক্ষের জলও দরিদ্রদের জন্য ফেলি-তেছেন!! উৎকল যেন মহাশ্মশান,—সহানু-ভূতি নাই, ভালবাসা নাই, দয়া নাই, যেন কিছুই নাই! গবর্ণমেণ্টের কাজে অবাধে চুরি চলিতেছে, কটকের কমিটী অল্প দরে চাউল বিক্রয় করিতেছেন। যাহাদের কিছুই নাই, তাহারা কোথায় চাউল কিনিবার পয়সা পাইবে? গড়জাত হইতে অসংখ্য লোক কটকে ভিক্ষার জন্য আসিয়াছিল; সংবাদ পত্রে পড়িয়াছি, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছেন! এমন লোক নাই যে, এই অবৈধ নিষ্ক্রমণ প্রতিরোধ করে। হায় উৎকল, হায় রাজনগর, এই দারুণ দুর্দ্দিনে তোমাদের ভাগ্যে কি আছে কে জানে?

গীতাতত্ত্ব। (১)

(ক) অবতরণিকা।

সমুদ্র মন্থন করিয়া যেমন অমৃত উদ্ভূত হইয়াছিল, সেইরূপ, অনন্ত হিন্দু শাস্ত্র মন্থন করিয়া গীতা রূপ দুর্লভ বস্তু উদ্ভূত হইয়াছে। মন্থন-কর্ত্তা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সংগ্রহ-কর্ত্তা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। যুগের পর যুগ এবং সভ্যতার (civilization) পর সভ্যতা, এইরূপে কত যুগ এবং সভ্যতা যে কাটিয়া গিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। বর্ত্তমান সভ্যতার নাম আর্য্যসভ্যতা। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ এই সভ্যতার চরম লক্ষ্য। পুরাতন ঋষিগণ এই সভ্যতার স্থাপয়িতা। এই সভ্যতার মহান্ আদর্শ প্রাচীনকালে আর্য্যজাতির সম্মুখে তাঁহারা স্থাপন করিয়াছিলেন। তখন মনুষ্য জাতির শৈশব অবস্থা। সেই শৈশব অবস্থায় তাঁহারা প্রথমে হস্ত ধরিয়া মনুষ্যগণকে উক্ত মহান্ আদর্শের দিকে চালিত করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বীয় পদের উপর ভর দিয়া দণ্ডায়মান হইতে শিক্ষা করিতে পারিবে বলিয়া, মাতা যেমন শিশু সন্তানের হস্ত ছাড়িয়া দিয়া দূর হইতে তাহার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন, সেইরূপ, শিশুমানব যাহাতে বলিষ্ঠ হইয়া কৈশোরে পদার্পণ করিতে পারে, ক্রমবিকশিত হইয়া যাহাতে আর্য্য সভ্যতার চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারে, তজ্জন্য আর্য্য সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা ঋষিগণ শিশুমানবের হস্ত ছাড়িয়া দিয়া, দূর হইতে তাহার ভাগ্য-পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্ব্বল মনুষ্যগণ ঋষিগণের প্রতিভা ও সামর্থ্য কোথায় পাইবে? তাহারা প্রতি পদে পদে বিচলিত হইতে লাগিল এবং অবশেষে আর্য্যসভ্যতার চরম লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সেই মহান্ আদর্শ হারাইয়া ফেলিল। তখন ধর্ম্মের পতন ও অধর্ম্মের ঘোরতর অভ্যুত্থান হইয়া উঠিল এবং ভারত রাহুগ্রস্ত শশীর ন্যায় দুষ্কৃতকারীদের কবকবলিত হইয়া পড়িল। দুষ্কৃতকারীদের দমন পূর্ব্বক আর্য্যসভ্যতার চরম লক্ষ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপনের জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ঋষিগণ ধর্ম্মের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, যুগধর্ম্মে শিশুমানব সেই আদর্শ হইতে চ্যুত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার অতুলনীয় ধর্ম্মমত সকল ব্যাসদেব কর্ত্তৃক গীতাকারে গ্রথিত হইয়াছে। সমুদয় বেদ, পুরাণ, দর্শন ও উপনিষদ আলোড়ন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনকে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই গীতাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে,—

"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতংমহৎ ॥"

অর্থাৎ, সমুদয় উপনিষদ গাভীগণের ন্যায়, গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ইহাদের দোগ্ধা, অর্জ্জুন বৎসের ন্যায়, সুধীগণ ভোক্তা সদৃশ এবং গীতা রূপ মহান্ অমৃত দুগ্ধের সদৃশ। এই জন্য গীতাকে উপনিষদ্ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে, এই জন্য গীতাকে হিন্দুশাস্ত্র সমূহের সার অংশ বলা হয়। এই জন্যই গীতা হিন্দুদিগের নিকট এত আদরের বস্তু।

ক্রমশঃ

শ্রীআশুতোষ দেব।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। সয়রুল মোতাখরীণ—নমুনা। ৺গৌরসুন্দর মৈত্র কর্তৃক মূল পারস্য পুস্তক হইতে বঙ্গভাষায় অনুবাদিত। প্রকাশক শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র। এই নমুনা পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। যোগীন্দ্র বাবু এই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত করিতে পারিলে বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত উপকার হইবে।

২। এড়ি পোকার চাষ। (বিনা মূল ধনে ব্যবসায়।) শ্রীঅনুকূলচন্দ্র রায়; মূল্য ৵০। রেশম পোকার সবিশেষ বিবরণ এই পুস্তকে সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

৩। কোরক—প্রথম খণ্ড। ছাত্রজীবনে লিখিত অপ্রকাশিত রচনার উৎকৃষ্টাংশ। উদ্দেশ্য এবং উদ্যম প্রশংসনীয়। লেখাও সুন্দর।

৪। কিরাতার্জ্জুন। ভারবি কৃত। বঙ্গানুবাদ। প্রথম ভাগ। প্রথম ৫ সর্গ। শ্রীনবীনচন্দ্র দাস কবি-গুণাকর, এম-এ, বি-এল পদ্যানুদিত। টীকা সহ। নবীন বাবু একজন অসাধারণ কবি। তাঁহাকে নূতন উপাধি-ভূষিত করা হইয়াছে, ইহাতে গৌরবান্বিত হইলাম। বাঙ্গালা ভাষার প্রতি গুণগ্রাহী লোকের ইহা অনুরাগের অন্যতম চিহ্ন। এমন বিশুদ্ধ, বিশদ এবং সরস অনুবাদ দুর্লভ জিনিষ। আমরা পড়িয়া সুখী হইলাম। আশা করি, সর্ব্বত্র এই পুস্তকের আদর হইবে।

৫। গন্ধপুষ্প। শ্রীমতিলাল দাস, বি-এ প্রণীত, মূল্য ৸০। শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ এই পুস্তকের এক পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন।

এই ভূমিকায় পুস্তকের গৌরব বাড়িয়াছে কিনা, জানি না। এই ভূমিকায় "ঈঙ্গিত-বোধিত", "হৃদয়িক", "প্রাণ-তর্পণ"—প্রভৃতি নূতন পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ভাষাকে দুর্ব্বোধ্য করিবার জন্য কেন যে এরূপ চেষ্টা হয়, বুঝি না। বিশ্বাস ভক্তির কথা যত সরল ভাবে ব্যক্ত করা যায়, ততই ভাল, কিন্তু বিশ্বাসী এবং ভক্ত ভিন্ন সে কথা কে বুঝিবে?

গন্ধপুষ্প গীতি-কবিতা। বিশ্বাস এবং ভক্তির অস্ফুট ভাব প্রতি কবিতায় বিজড়িত। এহেন পুস্তক আমরা পড়িয়া বিমুগ্ধ হইতে পারি, কিন্তু সাধারণের নিকট পরিচিত করিয়া দিতে পারি, এমন শক্তি আমাদিগের নাই। তাঁহার

(মোরা) ভবপুরের এমন ধনে
ভুলতে কি আর পারি?
(তাই) মাঝে মাঝে দিয়ে যাই গো
নীল সমুদ্র পাড়ী।
নিশার আগমে
ধরণী যখন
ঘুম ঘোরে পড়ে লুটিয়া,
অসীমের বুকে
প্রেমের কুহকে
কোটি চন্দ্র উঠে ফুটিয়া।
অমৃত লহরে
দূর দূরান্তে
জ্যোস্না গাঁড়য়ে যায়,
কতই উক্কা।
দলে দলে, আহা,
মহা শূন্য পথে ধায়;—
অমনি পুলকে
আঁখির পলকে
ধরণীর পানে ছুটি,
ঐ নীল সমুদ্র
পাড়ী দিয়া মোরা
মাতৃ-হারা ছুটি!

পড়িতে পড়িতে আমরা জগতের সৌন্দর্য্য-সাগরে নিমগ্ন হইয়া যাই,—মনে হয়, কি, সুন্দর, কি সুন্দর॥

সৌন্দর্য্যের কথা যদি তুলিলাম—আর একটু স্থান উদ্ধৃত করি—

সুনীল গগন তলে
সোণার চন্দ্রমা দোলে,
প্রেমের বিজলি জ্বলে
'শঙ্কা' সলিলে!
হাসেরে স্বপন-রাণি
তুলিয়ে ঘোম্‌টা খানি,—
কত মুক্তা হীরা মণি
ধরা-প্রাণে ফলে!
নদী কয়ে কুলু কুলু
বায়ু বলে ঢুলু ঢুলু,
শ্যামা গাহে 'উলু উলু'
শ্যামল শাখায়;

কনক-লহরী মালা
পুলকে করোর খেলা,—
বিহ্বলা তারকা-বালা
আঁখি মেলি চায়।
সোণামুখী সোণ দল,
চে'য়ে আছে ফুটিকুল,
দলে দলে অলিকুল।
মধু চুরি করে,
ছোট ছোট টুনি পাখি
প্রেমে উঠে ডাকি ডাকি,
তৃণদলে থাকি থাকি
ঘুমাইয়া পড়ে।
অদূরে কৃষক-নারী
শিশুটিকে বুকে ধরি,
বার বার ফিরি ফিরি
নদী পানে চায়,—
তটিনী বুঝিল ভাষা,
—জননীর ভালবাসা,—
এত স্নেহ এত আশা
কোথায় লুকায়।
মধুর মধুর নিশি।
আহ্লাদে গড়ায় শশি।
চারি দিকে হাসাহাসি
বৃন্দাবনে ঢেউ।
ভাবে ভোলা হরি-বোলা,
হরি নিয়ে করে খেলা,
পূর্ণিমার প্রেম-লীলা,
দেখেনারে কেউ।

এরূপ বিমল সৌন্দর্য্য-বোধ যে সে লেখকের ভাগ্যে ঘটে না। লেখক ভক্ত,—ভক্তির একটী উচ্ছ্বাস তুলিয়া আমাদের মন্তব্য শেষ করিতেছি। এরূপ ভক্তি-মাখা পুস্তক ঘরে ঘরে আদৃত হউক।

এবিজন পুরে
তোমারি লাগিয়া
একলাটী আছি পড়িয়া ;
নয়নের জল
মজিছে নয়নে
তোমার নামটী স্মরিয়া।
নিখিল বিশ্ব
লুটিয়ে পড়িছে
বিঘোর নিদ্রাবেশে,
এ হৃদয় শুধু
জেগে আছে, প্রিয়,
তোমার মিলন আশে।
(মোর) বড়ই বাসনা
মানস-মাঝারে,
বসা'য়ে তোমারে যতনে,
প্রাণের সোহাগে
সাজা'য়ে দিব'গো
বিমল-ভক্তি-রতনে।
(আমি) বক্ষ-কুটীরে
প্রেমের দীপটী
রেখেছি গোপনে জ্বালিয়া।
দুয়ারের পানে
চেয়ে আছি সদা
তুমি আস আস ভাবিয়া।
একে একে ঐ
দেখা দিল সব
আকাশে তারকাকুল,
একে একে, আহা!
ফুটিয়া গেল'রে
কত ছিল বনে ফুল।
(ওগো) তবু তুমি সাড়া দিলে না,
সদা নিকুঞ্জে এলে না!
এ অধীন জনে
দয়াটী করিয়া
চরণে টানিয়া নিলেনা।
তবু, প্রাণনাথ।
এই ভোলামন
তোমাকেই শুধু চায় ;
নিমেষে নিমেষে
তব উদ্দেশে
অনন্তের পথে ধায়।
তব প্রেম তরে
সঁপিয়াছি সব
কি আর বলিব আমি ?
পরাণের কথা
মরমের ব্যথা
সকলি জানগো তুমি।
করিয়াছি পণ
তোমারি সাধনে
এ ছার জীবন খোয়াব ;
বসি আপনার
সমাধি-মন্দিরে
তব রূপ নিত্য ধেয়াব।

গীতাতত্ত্ব। (২)

(খ) গ্রন্থোৎপত্তি।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে যখন কুরু ও পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ সমর সজ্জায় সজ্জিত হইয়া যুদ্ধের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতেছিলেন, তখন অর্জ্জুনের মনে বিষাদ উপস্থিত হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ স্থলে অর্জ্জুনকে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই গীতাকারে ছন্দোবদ্ধ হইয়াছে। এই যুদ্ধ সংঘটনের কারণ নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুনের সাহস এবং বিক্রমে সমস্ত ভারতের একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। ইহাতে দুর্য্যোধনের মনে ঈর্ষাবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি কুটীল বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ণ দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করেন। ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় বাধ্য হন, কিন্তু তিনি এই ক্রীড়ায় যথা সর্ব্বস্ব হারিয়া যান। দ্যূতক্রীড়ার পণ অনুসারে তিনি রাজ্যাদি যথাসর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশ বৎসর সন্ন্যাসীর ন্যায় তাঁহার স্ত্রী ও ভ্রাতৃগণের সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং অপর এক বৎসরকাল বিরাট রাজগৃহে অজ্ঞাতসারে বাস করেন। পণের এইরূপ নিয়ম ছিল যে, যদি তাঁহারা উহা রক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাদিগের রাজত্ব পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন।

পণের নিয়ম রক্ষা করিয়া অজ্ঞাতবাসের পর যখন যুধিষ্ঠির প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন দুর্য্যোধন রাজ্য প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অস্বীকৃত হইলেন। পাণ্ডবেরা তাঁহার নিকট কেবল মাত্র পঞ্চ গ্রাম যাচ্ঞা করিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন তাঁহাদের সেই প্রস্তাব ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিলেন। এই বিতণ্ডা মিটাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কৌরব সভায় দুর্য্যোধনের নিকট গিয়া তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন যে, ন্যায়মতে সমস্ত রাজত্বই যুধিষ্ঠিরের প্রাপ্তব্য। দুর্য্যোধন যদি সমস্ত রাজত্ব যুধিষ্ঠিরকে প্রত্যার্পণ নাও করেন, তবে অর্দ্ধেক রাজত্ব দিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করুন। শ্রীকৃষ্ণের এই দৌত্য-কার্য্য মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বের মধ্যে 'ভগবদ্‌যান' নামক পর্ব্বাধ্যায়ে সবিশেষ বর্ণিত আছে। 'ভগবদ্‌যান' পর্ব্বাধ্যায়ই গীতার ভূমিকা। শ্রীকৃষ্ণ কৌরব সভায় যাইবার পূর্ব্বে বিদুরের সহিত এ বিষয়ে যাহা কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"হে বিদুর! আমি দুর্য্যোধনের দৌরাত্ম্য ও ক্ষত্রিয়গণের শত্রুতা অবগত হইয়াই এখানে আগমন করিয়াছি। যিনি অশ্বকুঞ্জররথসমবেত বিপর্য্যস্ত সমুদয় পৃথিবী মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত করিতে সমর্থ হন, তাঁহার উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম লাভ হয়। কর্ণ ও দুর্য্যোধনের অপরাধে কুরুকুলে ঘোরতর আপৎ সমুপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে যাহাতে সংগ্রামে বিনাশোন্মুখ কৌরব ও সৃঞ্জয়গণের শান্তি হয়, তৎ সম্পাদনে আমি যথাসাধ্য যত্ন করিব।"

"হে বিদুর! যে ব্যক্তি ব্যসনগ্রস্ত বান্ধবকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্নবান না হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে নৃশংস বলিয়া কীর্ত্তন করেন। আমি ধার্ত্তরাষ্ট্র, পাণ্ডব ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের হিতার্থে যে সকল কথা কহিব, তৎসমুদায় গ্রহণ করা দুর্য্যোধনের

অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি তিনি আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়াও আমার প্রতি শঙ্কা করেন, তাহাতে আমার কিছু মাত্র ক্ষতি নাই। আমি কুরুপাণ্ডবগণের শান্তির নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য না হইলেও অধার্ম্মিক মূঢ়গণ বা আত্মীয়গণ কখনই বলিতে পারিবে না যে, কৃষ্ণ সমর্থ হইয়াও ক্রোধ-বিমূঢ় কুরুপাণ্ডবগণকে নিবারণ করিল না। আমি উভয় পক্ষের অর্থ সাধন করিবার নিমিত্ত এস্থানে আগমন করিয়াছি, অতএব উভয় পক্ষেরই অর্থসাধনে প্রাণপনে যত্ন করিয়া জনসমাজে অনিন্দনীয় হইব। যদি দুর্য্যোধন বালস্বভাব প্রযুক্ত আমার ধর্ম্মার্থযুক্ত হিতকর বাক্য গ্রহণ না করেন, তবে তাঁহার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে।"

"হে মহাত্মন্! আমি যদি পাণ্ডবগণের অর্থের অবিঘাতে কৌরবগণের সহিত তাহাদের সন্ধি সংস্থাপন করিতে পারি, তাহা হইলে আমার পুণ্য লাভ ও কৌরবগণের মৃত্যু পাশ হইতে মুক্তি হইবে। ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ কি আমার ধর্ম্মার্থযুক্ত নির্দ্দোষ বাক্য শ্রবণ করিবে? আমি কুরুসভায় গমন করিলে কৌরবগণ কি আমার সম্মান করিবে? যাহা হউক, সিংহ যেমন অন্যান্য পশুগণকে অনায়াসে বিনাশ করিতে পারে, তদ্রূপ আমি সমুদায় কৌরবপক্ষীয় ভূপতিদিগকে অবলীলাক্রমে সংহার করিতে পারি।" *

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৌরব সভায় উপস্থিত হইলে, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণাদি ও সহস্র সহস্র ভূপতিগণ সহ আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। সেই সভাতে নারদাদি ঋষিগণও তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনকে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি বলিলেন ;—

"দুর্য্যোধন! তোমার ও তোমার বংশের সবিশেষ শান্তিকর বাক্য শ্রবণ কর। তুমি মহাপ্রাজ্ঞকুলে সমুৎপন্ন, শাস্ত্রজ্ঞ এবং সদাচার প্রভৃতি সমুদয় সৎগুণে অলঙ্কৃত হইয়াছ, অতএব সন্ধি সংস্থাপন করাই তোমার সমুচিত কর্ম্ম। তোমার যেরূপ সংকল্প, দুষ্কুলজাত নৃশংস নির্লজ্জ ব্যক্তিরাই তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকে। সাধু ব্যক্তিদিগের প্রবৃত্তি ধর্ম্মার্থের অনুগত, অসাধুরাই বিপরীত ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু তোমাতে সেই বিপরীত ব্যবহার বারম্বার নয়নগোচর হইতেছে। ঈদৃশ ব্যবহারে ঘোরতর অধর্ম্ম, প্রাণনাশের কারণ, অনিষ্ট ও অপ্রতিবিধেয় দুর্নিমিত্ত সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এক্ষণে তুমি সেই অনর্থ পরিহার পূর্ব্বক আপনার ভ্রাতৃগণের, ভৃত্যগণের ও মিত্রগণের শ্রেয় সাধন কর, তাহা হইলে তুমি অধর্ম্ম-জনক এবং অযশস্কর কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইবে। আর এক্ষণে প্রাজ্ঞ, শূর, মহোৎসাহ-সম্পন্ন, মহানুভব এবং শাস্ত্রজ্ঞ পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন কর। তাহা হইলে ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্র, পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণ, মহামতি বিদুর, কৃপ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, অশ্বত্থমা, বিকর্ণ, সঞ্জয়, বিবিংশতি, জ্ঞাতিগণ ও জ্ঞান-সম্পন্ন অন্যান্য মিত্রগণ সাতিশয় সুখী হইবেন। ফলতঃ সন্ধিস্থাপন হইলে, সমস্ত জগৎ আনন্দে পরিপূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই। তুমি লজ্জা-শীল, সৎকুল-জাত, শাস্ত্রজ্ঞ ও সদয় স্বভাব, অতএব পিতামাতার শাসনে অবস্থান কর।"

"ভ্রাত! পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করা তোমার পিতার ও অমাত্যগণের নিতান্ত অভিপ্রেত; এক্ষণে তাহা তোমারও অনুমোদিত হউক। যে ব্যক্তি সুহৃদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া গ্রাহ্য না করে, যেমন মহাকাল ফল ভক্ষণ করিলে পরিণামে পরিতাপিত হইতে হয়, তদ্রূপ সেই ব্যক্তিকে পরিশেষে সাতিশয় ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। যে দীর্ঘসূত্রী মোহ বশত কল্যাণকর বাক্য পরিত্যাগ করে, তাহাকে পুরুষার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট ও পশ্চাত্তাপে পরিতাপিত হইতে হয়। যে ব্যক্তি অর্থকাম ব্যক্তিদিগের মত বিরোধী বাক্য সহ্য না করে, কিন্তু বাস্তবিক প্রতিকূল বাক্য গ্রহণ করে, সে অরাতিগণের বশবর্ত্তী হয়। যে ব্যক্তি অসাধুগণের সেবা, অনর্থ কার্য্যের অনুষ্ঠান, সাধু সুহৃদগণের

* ৺ কালিসিংহের মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব ৯২ অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত।

বাক্যে উপেক্ষা, অনাত্মীয়ের সমাদর ও আত্মীয়গণের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করে, পৃথিবী তাহারে পরিত্যাগ করেন। অতএব তুমি কি নিমিত্ত মহাবীর পাণ্ডবগণের সহিত বিরোধ করিয়া অশিষ্ট, অসমর্থ মূঢ়গণের সাহায্যে পরিত্রাণ লাভের অভিলাষ করিতেছ? এই মেদিনীমণ্ডলে তোমা ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি ইন্দ্র সদৃশ মহারথ ভূপতিগণকে অতিক্রম করিয়া অন্য হইতে পরিত্রাণের প্রত্যাশা করে? পাণ্ডবগণ এইরূপ ধর্ম্মপরায়ণ যে, তুমি তাঁহাদিগকে জন্মাবধি প্রতিনিয়ত নিগৃহীত করিয়াছ, তথাপি তাঁহারা কখন জাতক্রোধ হন নাই। তুমি জন্মাবধি সেই পাণ্ডবগণের প্রতি মিথ্যা ব্যবহার করিয়াছ, তথাপি তাঁহারা তোমার প্রতি সম্যক্ সন্তুষ্ট আছেন। অতএব তাঁহাদের প্রতি সম্যক্ পরিতুষ্ট হওয়া তোমারও কর্ত্তব্য। প্রকৃত বন্ধুগণের প্রতি কদাচ জাতক্রোধ হইও না।”

“হে দুর্য্যোধন। তুমি হীন উপায় অবলম্বন করিয়া সকল রাজবিখ্যাত অতি বিস্তীর্ণ আধিরাজ্য লাভে সমুৎসুক হইয়াছ। যে ব্যক্তি সত্যপরায়ণদিগের প্রতি মিথ্যা ব্যবহার করে, সেই ব্যক্তি পরশু দ্বারা বনচ্ছেদনের ন্যায় আপনারে ছেদন করে। হে ভারত! অসাধু সংসর্গ অপেক্ষা পাণ্ডবগণের সহিত সমাগম তোমার নিতান্ত শ্রেয়স্কর। তাঁহারা তোমার প্রতি পরিতুষ্ট থাকিলে তোমার সকল কামনা পরিপূর্ণ হইবে। তুমি যে দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনির উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া ঐশ্বর্য্যাভিলাষী হইয়াছ, তাহারা কি জ্ঞানে, কি ধর্ম্মে, কি অর্থে, কি বিক্রমে কিছুতেই পাণ্ডবগণের সমকক্ষ নয়। কেবল উহারা নয়, এই সমুদায় রাজা একত্র হইলেও যুদ্ধকালে কুপিত বৃকোদরের মুখ সন্দর্শনে সমর্থ হইবে না। এই সন্নিহিত সেনাগণ এবং ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, ভূরিশ্রবা, সৌমদত্ত, অশ্বত্থমা ও জয়দ্রথ ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে অসমর্থ হইবেন। কি সুর, কি অসুর, কি মনুষ্য, কি গন্ধর্ব্ব, কেহই ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিতে পারেন না। অতএব তুমি যুদ্ধাভিলাষ পরিত্যাগ কর।”

“অথবা সমুদায় পার্থিব সেনার মধ্যে এমন এক বীরকে অনুসন্ধান কর, যে ব্যক্তি ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া সুমঙ্গলে গৃহে প্রত্যাগত হইতে সমর্থ হন। অনর্থক লোক ক্ষয়ে প্রয়োজন নাই. যিনি জয়লাভ করিলে তোমার জয়লাভ হইবে, ঈদৃশ কোন পুরুষকে আনয়ন কর। কিন্তু যে ধনঞ্জয় খাণ্ডবপ্রস্থে দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর ও পন্নগগণকে পরাভূত করিয়াছেন, কে তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিবে? আর, একজন যে বহু ব্যক্তিকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়, বিরাট নগরে ইহার আশ্চর্য্য নিদর্শন অবলোকন করিয়াছি। যিনি সমরে আদিদেব ভগবান্ মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন, তুমি কি সেই অজেয়, অধৃষ্য বীরবর তেজস্বী অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ কর? আমি সাহায্য করিলে কে তাঁহার সহিত যুদ্ধ প্রার্থনা করিবে? যদি ধনঞ্জয় যুদ্ধে আগমন করেন, সাক্ষাৎ দেবরাজ কি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হন? যে ব্যক্তি বাহু দ্বারা ধরা ধারণে সমর্থ হয়, যে ব্যক্তি অমর্ষ পরবশ হইয়া এই সমুদায় প্রজাকে দগ্ধ করিতে পারে এবং যে ব্যক্তি দেবগণকে স্বর্গ ভ্রষ্ট করিতে সমর্থ হয়, সেই ব্যক্তিই ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিতে পারে। পুত্র, ভ্রাতা, জ্ঞাতি ও সম্বন্ধিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, এই সকল ভারতশ্রেষ্ঠগণ যেন তোমার নিমিত্ত বিনাশ প্রাপ্ত না হয়। যেন কৌরবগণের শেষ বিদ্যমান থাকে, সমুদয় কুল উচ্ছিন্ন করিও না। তুমি যেন নষ্ট কীর্ত্তি ও কুলঘ্ন বলিয়া বিখ্যাত না হও। মহারথ পাণ্ডবগণ তোমারে যৌবরাজ্যে ও তোমার পিতাকে মহারাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। অতএব এই আগমোন্মুখী রাজলক্ষ্মীরে অবমাননা করিও না। সুহৃদ্গণের বাক্য রক্ষা, পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি সংস্থাপন ও তাঁহাদিগকে রাজার্দ্ধ প্রদান করিয়া মহতী শ্রীলাভ কর এবং মিত্রগণের প্রীতিভাজন হইয়া চিরকাল কুশলে অবস্থান কর।”*

* ৺কালিসিংহের মহাভারত হইতে উদ্ধৃত। উদ্যোগপর্ব্ব, ভগবদ্‌যান পর্ব্বাধ্যায়, ১২৩ অধ্যায়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই সকল সদ্‌যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়াও দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন না। তিনি বলিলেন যে,—

"সূচ্যগ্রেণ সুতীক্ষ্ণেণ ভিদ্যতে যা চ মেদিনী।
তদৰ্দ্ধং নৈব দাস্যামি বিনা যুদ্ধেন কেশব॥"

অর্থাৎ, সূচ্যগ্র পরিমাণ মেদিনীও তিনি পাণ্ডবদিগকে বিনাযুদ্ধে দিবেন না। সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। কৌরব ও পাণ্ডবেরা, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের সহিত সসৈন্যে কুরুক্ষেত্রের মহা প্রাঙ্গণে সমবেত হইলেন। ভারতের প্রধান প্রধান রাজন্যবর্গ সসৈন্যে এক পক্ষে না হয় আর এক পক্ষে যোগ দিলেন। পাণ্ডব পক্ষে সপ্ত অক্ষৌহিণী এবং দুর্য্যোধন পক্ষে একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগৃহীত হইয়া বিশাল সমুদ্রের ন্যায় কুরু পাণ্ডবের সৈন্যব্যূহ সজ্জিত হইল। রণোন্মুখ কুরু পাণ্ডবের শঙ্খনাদে যখন সমর প্রাঙ্গণ কম্পিত হইতেছিল, তখনই গীতার সূত্রপাত হইয়াছে।

মহাভারতের যাঁহারা প্রধান নায়ক, তাঁহারাই গীতার নায়ক। শ্রীকৃষ্ণ এই ভীষণ সমরে সারথি মাত্র। ঐতিহাসিক ভাবে যদিও এই যুদ্ধ কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ বলিয়া খ্যাত কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, ইহা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের যুদ্ধ,—একদিকে মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির এবং অপর দিকে মূর্ত্তিমান অধর্ম্ম দুর্য্যোধন। মহাভারতেও উল্লিখিত হইয়াছে যে, দুর্য্যোধন ক্রোধময় মহাবৃক্ষ, কর্ণ তাহার স্কন্ধ, শকুনি শাখাস্বরূপ, দুঃশাসন ফল ও পুষ্প, মনস্বী রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ, অর্জ্জুন স্কন্ধ, ভীমসেন তাহার শাখা, মাদ্রীসুত নকুল সহদেব তাহার পুষ্প ও ফল এবং কৃষ্ণ, ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণগণ তাহার মূল। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের যুদ্ধ ধর্ম্মক্ষেত্র ভিন্ন আর কোথায় হইবে? আধ্যাত্মিক জগতে এই যুদ্ধ অহর্নিশি চলিতেছে এবং অবশেষে ধর্ম্মেরই জয় দৃষ্ট হইতেছে।

কুরুক্ষেত্রে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইবার বিশেষত্ব আছে। কুরুক্ষেত্র একটী জনপদ বা চক্র—থানেশ্বর এবং পাণিপথের নিকটবর্ত্তী। মহাভারতের বনপর্ব্বে ইহাকে ত্রিলোকীর মধ্যে প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত করা হইয়াছে। কৌরবগণের আদি পুরুষ কুরুরাজা এখানে বরলাভ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া ইহা পুণ্যতীর্থ রূপে পরিগণিত হইয়া কুরুক্ষেত্র নামে প্রচলিত হইয়াছে। শতপথ ও তৈত্তেরেয় উপনিষদে কুরুক্ষেত্রকে ধর্ম্মক্ষেত্র আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। সেই পুরাতন চিরপ্রসিদ্ধ পবিত্র মহাক্ষেত্র ভিন্ন আর কোথায় এই যুগ-বিপ্লবকারী যুদ্ধ সংঘটিত হইবে? সেই ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবগণ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনাসহ একত্রে সমবেত হইয়াছিলেন।

এই যুদ্ধের কিছু পূর্ব্বে ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র তখন হস্তিনাপুরে ছিলেন। কিন্তু জন্মান্ধ বলিয়া যুদ্ধ দর্শনে বঞ্চিত হওয়ায় অস্থির হইয়াছিলেন। ব্যাসদেব তাঁহাকে যুদ্ধদর্শন করিবার জন্য দিব্যচক্ষু প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, তিনি অস্বীকৃত হইলেন এবং বলিলেন যে তিনি জ্ঞাতিবধ দর্শন করিতে ইচ্ছুক নহেন। তখন ব্যাসদেব তাঁহার মন্ত্রী সঞ্জয়কে দিব্যচক্ষু প্রদান করিলেন। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে থাকিয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধবৃত্তান্ত দিব্যচক্ষে দেখিতে লাগিলেন—এবং আনুপূর্ব্বিক ধৃতরাষ্ট্রকে

বর্ণনা করিতে লাগিলেন। সঞ্জয় যখন বলিলেন যে, উভয়পক্ষীয় সৈন্য সকলে যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইয়াছে, তখন ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন যে উভয় পক্ষ কি করিলেন? এই স্থলেই গীতা আরম্ভ হইয়াছে।

(গ) গীতার কাব্যাংশ।

গীতার কাব্যাংশ অতি উৎকৃষ্ট। "ভূতভাবন ভগবান স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ইহার বক্তা। শক্রনিসূদন, বিশ্ববিজেতা, শিবপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দ্রতনয় ধনঞ্জয় ইহার শ্রোতা। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমরাঙ্গন যে কুরুক্ষেত্র, তাহাই ইহার স্থল, আর যখন রণোন্মুখ কুরুপাণ্ডবের শঙ্খনাদে পৃথিবী তুমুল কলরবে পরিপূরিত হইতেছে, তাহাই ইহার সময়। স্থান কাল পাত্র সম্বন্ধে এরূপ সমৃদ্ধ কাব্য আর কোথায় দেখিতে পাইবে?"*

বঙ্গীয় সাহিত্য জগতের রাজা বঙ্কিমচন্দ্র গীতার কাব্যাংশের সুখ্যাতি করিয়া লিখিয়াছেন,—"কুরুক্ষেত্রে উভয় সেনা সুসজ্জিত হইয়া পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে। পাণ্ডবদিগের মহতী সেনা ব্যূহবদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন, পরম রণপণ্ডিত আপনার আচার্য্যকে দেখাইলেন। একটু ভীত হইয়া আচার্য্যকে বলিলেন, 'আপনারা আমার সেনাপতি ভীষ্মকে রক্ষা করিবেন।' কিন্তু সেই বৃদ্ধ ভীষ্ম যুবার অপেক্ষাও উত্তমশীল—তিনি সেই সময়ে সিংহনাদ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন—(শঙ্খ তখনকার bugle)। তাঁহার শঙ্খধ্বনি শুনিয়া উৎসাহে বা প্রত্যুত্তরে উভয় সৈন্যস্থ যোদ্ধৃগণ সকলেই শঙ্খধ্বনি করিলেন। তখন উভয়দলে নানাবিধ রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল—শঙ্খে, ভেরীতে, অন্যান্য বাদ্যের কোলাহলে, গগন বিদীর্ণ হইল—আকাশ পৃথিবী তুমুল হইয়া উঠিল। সেই মহোৎসাহের সময়ে স্থিরচিত্ত অর্জ্জুন—যাঁহার উপরে কৌরবজয়ের ভার—আপনার সারথি কৃষ্ণকে বলিলেন—'একবার উভয়সেনার মধ্যে রথ রাখ দেখি—দেখি কাহার সঙ্গে আমার যুদ্ধ করিতে হইবে।' কৃষ্ণ, শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথ উভয়সেনার মধ্যে স্থাপিত করিলেন,—সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকর্ত্তা বলিলেন, 'এই দেখ।' অর্জ্জুন দেখিলেন, দুই দিকেই ত আপনার জন,—পিতৃব্য, পিতামহ, পুত্র, পৌত্র, মাতুল, শ্বশুর, শ্যালক, সুহৃৎ, সখা—তাঁহার গা কাঁপিয়া উঠিল, শরীরে রোমাঞ্চ হইল, মুখ শুকাইল, দেহ অবসন্ন হইল, মাথা ঘুরিল, হাত হইতে সেই মহাধনু গাণ্ডীব খসিয়া পড়িল। বলিলেন 'কৃষ্ণ! রাজ্য যাদের জন্য, তাদের মারিয়া কি ফল?—আমি যুদ্ধ করিব না।' এই সংগ্রাম-ক্ষেত্রে দুইদিকে দুই মহতীসেনা, এই তুমুল কোলাহল, রণবাদ্য এবং ঘোরতর উৎসাহ—সেই সময়ে এই মহাবীরের প্রথমে স্থৈর্য্য, তারপর তাঁহার হৃদয়ে সেই করুণ এবং মহান্ প্রশান্ত ভাব—এরূপ মহচ্চিত্র সাহিত্যজগতে দুর্লভ। 'ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ'—ঈদৃশী অমৃতময়ী বাণী আর কে কোথায় শুনিয়াছে?*"

গীতার কাব্যাংশ যেমন সুন্দর, দর্শনাংশ তেমনি মনোহর। বেদে যেমন তিনটী কাণ্ড আছে—কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড, গীতাতেও সেইরূপ তিনটী কাণ্ড আছে। গীতা সম্বন্ধে নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন যে,—

"ভারতে সর্ব্ববেদার্থো ভারতার্থশ্চ কৃৎস্নশঃ।
গীতায়ামস্তি তেনেয়ং সর্ব্বশাস্ত্রময়ীমতা॥
ইয়মষ্টাদশাধ্যায়ী ক্রমাৎ ষট্কত্রয়েণহি।
কর্ম্মোপাস্তি জ্ঞানকাণ্ড ত্রিতয়াত্মানিগদ্যতে॥"

* গীতারহস্য, ৭ পৃষ্ঠা।

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১ অধ্যায়।

সকল বেদের মত সকল শাস্ত্রের মত গীতায় নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্ম্মকাণ্ড, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে উপাসনাকাণ্ড এবং শেষ ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানকাণ্ড আলোচিত হইয়াছে।

(ঘ) গীতা ভগবানের বাক্য।

গীতা সম্বন্ধে অনেকে এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, কৃষ্ণার্জ্জুন রথে বসিয়া অনুষ্টুপ ইন্দ্রবজ্রা প্রভৃতি ছন্দে কথোপকথন করেন নাই। সুতরাং গীতা ভগবানের বাক্য নহে, ইহা গীতাকারেরই উক্তি। কিন্তু এইরূপ ভয় করিবার কোন কারণ নাই; কারণ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন, ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ বেদব্যাস সেই ধর্ম্ম সাত শত শ্লোকাকারে নিবদ্ধ করিয়া গীতা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। এইজন্য শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে,—"তং ধর্ম্মং ভগবতো যথোপদিষ্টং বেদব্যাসঃ সর্ব্বজ্ঞ ভগবান গীতাখ্যৈঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈকপনিববন্ধ।" শ্রীধর স্বামীও বলিয়াছেন যে,—"তমেব ভগবদুপদিষ্টমর্থং কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈ রূপনিববন্ধ। তত্রচ প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণমুখাদ্বিনিঃসৃতানেব শ্লোকানলিখৎ কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে স্বয়ঞ্চ ব্যরচয়েৎ। যাথোক্তং গীতামাহাত্ম্যে—, 'গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ। যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃত॥'"

অর্থাৎ, ভগবদুপদিষ্ট সেই ধর্ম্মকে ভগবান্ বেদব্যাস সপ্তশত শ্লোক দ্বারা নিবদ্ধ করিয়াছেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ইহাতে প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণমুখ নিঃসৃত শ্লোকই নিবদ্ধ করিয়াছেন। ভগবদ্বাক্য সঙ্গতির জন্য কোন কোন শ্লোক স্বয়ংও রচনা করিয়াছেন। গীতামাহাত্ম্যে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যাহা পদ্মনাভের মুখপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে, সেই গীতা শাস্ত্র উত্তমরূপে অভ্যাস করা উচিত, অন্য বিস্তৃত শাস্ত্রের প্রয়োজন কি? সুতরাং যাঁহারা আশঙ্কা করেন যে, গীতা বেদব্যাস কর্ত্তৃক রচিত হওয়াতে উহাতে যে সকল বিষয় আছে, তাহা তাঁহারই কৃত, তাঁহাদের এই আশঙ্কা পরিহারের জন্য শ্রীধরস্বামী পূর্ব্বোক্ত বাক্যগুলি বলিয়াছেন এবং শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, মহর্ষি বেদব্যাস সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ যথাযথ নিবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শাস্ত্রেও উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং স্বয়ম্।
কোহন্য পুণ্ডরীকাক্ষান্মহাভারতকৃদ্ ভবেৎ॥"

অর্থাৎ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া জানিবে। পুণ্ডরীকাক্ষ ভিন্ন এমন কে আছেন, যিনি মহাভারত রচনা করিতে সমর্থ? ব্যাসদেব ঈশ্বরের অংশসম্ভূত এবং সর্ব্বজ্ঞ ঋষি ছিলেন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ যথাযথ্য ভাবে গীতাতে নিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, গীতা ঠিক শ্রীকৃষ্ণের মুখের কথা নহে বলিয়া গীতা যে তাহার শিক্ষা নহে—এইরূপ যুক্তির সারবত্তা নাই। কিন্তু তাহা হইলে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, গীতা যদি ঠিক শ্রীকৃষ্ণের মুখের কথা নহে, তবে গ্রন্থ মধ্যে "শ্রীভগবানুবাচ", "অর্জ্জুনউবাচ", "সঞ্জয় উবাচ"—এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে কেন? পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ব্যাস সর্ব্বজ্ঞ ঋষি ছিলেন, তিনি স্বয়ং নারায়ণ, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সহিত একাত্মক ছিলেন—যোগ প্রভাবে তিনি কৃষ্ণভাবময়তা লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং যদিও তিনি কৃষ্ণকথা শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়াছেন, তথাপি তাহাতে অনুমাত্র ভ্রংশদোষ

হয় নাই। গীতার কথা ব্যাসদেব যেরূপ লিখিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ উহার লেখক হইলে ঐরূপই লিখিতেন। এই জন্যই ছন্দোবদ্ধ গীতা "কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ" নামে চিরকাল পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

(ঙ) গীতার শ্লোক সংখ্যা।

গীতা মহাভারতের অংশ, ভীষ্ম পর্ব্বের অন্তর্গত ভগবদ্গীতা পর্ব্বাধ্যায়ে ন্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মহাভারতে অনেক বিষয় প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, কিন্তু গীতাতে কিছুই প্রক্ষিপ্ত হয় নাই। গীতার শ্লোকের পাঠান্তর অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত শ্লেগেলের (Schelegel) মত এইরূপ যে, গীতাকার ইচ্ছা করিয়াই গীতাতে সাত শত শ্লোক নিবদ্ধ করিয়াছেন। সাত শতের অধিক আর একটীও শ্লোক রচিত না হইবার কারণ আর কিছুই নহে, বোধ হয় তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, তাহা হইলে পরে আরও শ্লোক উহাতে প্রক্ষিপ্ত হইবে। এই জন্য তিনি ইচ্ছা করিয়াই সাত শত সংখ্যা নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্যও গীতার ভাষ্যেতে লিখিয়াছেন যে, ৭০০ শ্লোকে গীতা রচিত হইয়াছে।

আমরাও গীতাতে শ্লোক সংখ্যা ৭০০ দেখিতে পাই। কিন্তু গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের পর ভীষ্ম পর্ব্বে যে অধ্যায় আছে, তাহাতে আমরা গীতার শ্লোক সংখ্যা অন্য প্রকার দেখিতে পাই। যথা,—

'ষট্‌শতানি সবিংশানি শ্লোকানাং প্রাহকেশবঃ।
অর্জ্জুনঃ সপ্তপঞ্চাশৎ সপ্তষষ্টিং তু সঞ্জয়ঃ॥ ৪
ধৃতরাষ্ট্রঃ শ্লোকমেকং গীতায়ামানমুচ্যতে॥৫"
(৪৩ অধ্যায়)

অর্থাৎ, কেশব ৬২০ শ্লোক, অর্জ্জুন ৫৭ শ্লোক, সঞ্জয় ৬৭ শ্লোক এবং ধৃতরাষ্ট্র কেবল একটী শ্লোক গীতাতে বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের সমষ্টি ৭০০ পরিবর্ত্তে ৭৪৫ হইতেছে, তাহা হইলে আর ৪৫ শ্লোক কোথায় গেল? মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন যে, গৌড়ে প্রচলিত মহাভারতে তিনি পূর্ব্বোক্ত অংশ দেখিতে পান নাই। তাঁহার মতে এই শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত।

আবার কেহ কেহ বলেন যে "কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে" ৭৪৫ সংখ্যা শ্লোকই আছে। তাঁহাদের মতে গীতায় ৭০০ শ্লোক ভিন্ন ভীষ্ম পর্ব্বান্তর্গত ২২শ ও ২৩শ অধ্যায়ের শ্লোকগুলিও "কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদের" মধ্যে নিবিষ্ট। ২২শ অধ্যায়ে সঞ্জয়োক্ত ১৪টী এবং কৃষ্ণোক্ত ১টী শ্লোক আছে এবং ২৩ অধ্যায়ে সঞ্জয়োক্ত ৩টী, কৃষ্ণোক্ত ৩টি, অর্জ্জুনোক্ত ১২টী এবং দেব্যুক্ত ১২টী—এই সর্ব্বশুদ্ধ ৪৫টী শ্লোক দৃষ্ট হয়। সুতরাং কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে যে সর্ব্বশুদ্ধ ৭৪৫ শ্লোকের উল্লেখ আছে, তাহা মিথ্যা নহে।

যাহা হউক, শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক উল্লিখিত সাত শত শ্লোকময় কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদই যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, তাহাতে আর কাহারও দ্বিমত নাই।

(চ) গীতোক্ত ধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম কি না?

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে কিনা, তাহা পরে বিবেচ্য, কিন্তু যাঁহারা গীতাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে বঙ্কিম বাবু অন্যতম। বঙ্কিম বাবু বলেন যে, গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু গীতা যে কৃষ্ণের ধর্ম্ম মতের সঙ্কলন, সে বিষয়ে আর

সন্দেহ নাই। যাহা হউক, গীতাকে যদি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও ইহাকে আমরা শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মমতের সঙ্কলন বলিতে বাধ্য। বঙ্কিম বাবু গীতা সম্বন্ধে "কৃষ্ণচরিত্রে" যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"যাহা আমরা ভগবদ্গীতা বলিয়া পাঠ করি, তাহা কৃষ্ণ প্রণীত নহে। উহা ব্যাস প্রণীত বলিয়া খ্যাত—"বৈয়াসিকী সংহিতা" নামে পরিচিত। উহার প্রণেতা ব্যাসই হউন আর যেই হউন, তিনি ঠিক কৃষ্ণের মুখের কথাগুলি নোট করিয়া রাখিয়া ঐ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন নাই। উহাকে মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়াও আমার বোধ হয় না। কিন্তু গীতা কৃষ্ণের ধর্ম্মমতের সঙ্কলন, ইহা আমার বিশ্বাস। তাঁহার মতাবলম্বী কোন মনীষী কর্ত্তৃক উহা এই আকারে সঙ্কলিত এবং মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, ইহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এখন বলিবার কথা এই যে, গীতোক্ত ধর্ম্ম যাঁহার প্রণীত, তিনি স্পষ্টতই অদ্বিতীয় বেদবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তিনি বেদকে সর্ব্বোচ্চ স্থানে বসাইতেন না—কখনও বা বেদের একটু আধটু নিন্দা করিতেন। কিন্তু তথাপি অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ ব্যতীত অন্যের দ্বারা গীতোক্ত ধর্ম্ম প্রণীত হয় নাই। ইহা যে গীতা ও বেদ উভয়ই অধ্যয়ন করে, সে অনায়াসেই বুঝিতে পারে।"

"আমরা বলিয়াছি, তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) জীবনের কাজ দুইটী, ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন এবং ধর্ম্মপ্রচার। মহাভারতে তাঁহার কৃত ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের কথা প্রধানতঃ ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত গীতা পর্ব্বাধ্যায়েই আছে। এখন বিচার উঠিতে পারে যে, গীতার যে ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, তাহা গীতাকার কৃষ্ণের মুখে বসাইয়াছেন বটে, কিন্তু সে ধর্ম্ম যে কৃষ্ণ প্রচারিত, কি গীতাকার প্রণীত, তাহার স্থিরতা কি? সৌভাগ্যক্রমে আমরা গীতা পর্ব্বাধ্যায় ভিন্ন মহাভারতের অন্যান্য অংশেও কৃষ্ণদত্ত ধর্ম্মোপদেশ দেখিতে পাই। যদি আমরা দেখি যে, গীতায় যে অভিনব ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে, আর মহাভারতের অন্যান্য অংশে কৃষ্ণ যে ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত করিতেছেন, ইহার মধ্যে একতা আছে, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে, এই ধর্ম্ম কৃষ্ণ প্রণীত এবং কৃষ্ণপ্রচারিতই বটে। মহাভারতের ঐতিহাসিকতা যদি স্বীকার করি, আর যদি দেখি যে মহাভারতকার যে ধর্ম্ম ব্যাখ্যা স্থানে স্থানে কৃষ্ণে আরোপ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্র এক প্রকৃতির ধর্ম্ম। যদি পুনশ্চ দেখি যে, সেই ধর্ম্ম প্রচলিত ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন প্রকৃতির ধর্ম্ম, তবে বলিব এই ধর্ম্ম কৃষ্ণেরই প্রচারিত। আবার যদি দেখি, গীতায় যে ধর্ম্ম সাবিস্তারে এবং পূর্ণতার সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার সহিত ঐ কৃষ্ণ-প্রচারিত ধর্ম্মের সঙ্গে ঐক্য আছে, উহা তাহারই আংশিক ব্যাখ্যা মাত্র, তবে বলিব যে গীতোক্ত ধর্ম্ম যথার্থই কৃষ্ণ প্রণীত বটে।"

"এখন দেখা যাউক, কৃষ্ণ এখানে (সঞ্জয়-যান পর্ব্বে) কি বলিতেছেন।"

"শুচি ও কুটুম্বপরিপালক হইয়া বেদাধ্যয়ন করতঃ জীবন যাপন করিবে, এইরূপ শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট বিধি বিদ্যমান থাকিলেও ব্রাহ্মণগণের নানাপ্রকার বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। কেহ কর্ম্মবশতঃ, কেহবা কর্ম্মপরিত্যাগ করিয়া এক মাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু যেমন ভোজন না করিলে তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রূপ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণগণের কদাচ মোক্ষ লাভ হয় না। যে সমস্ত বিদ্যাদ্বারা কর্ম্ম সংসাধন হইয়া থাকে, তাহাই ফলবতী, যাহাতে কোন কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি নাই, সে বিদ্যা নিতান্ত নিষ্ফল। অতএব যেমন পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির জলপান করিবামাত্র পিপাসা-শান্তি হয়, তদ্রূপ ইহকালে যে সকল কর্ম্মের ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। হে সঞ্জয়! কর্ম্ম-বশতঃই এইরূপ বিধি বিহিত হইয়াছে, সুতরাং কর্ম্মই সর্ব্বপ্রধান। যে ব্যক্তি কর্ম্ম অপেক্ষা অন্য কোন বিষয়কে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহার সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল হয়।"

"দেখ দেবগণ কর্ম্মবলে প্রভাব সম্পন্ন হইয়াছেন ; সমীরণ কর্ম্মবলে সতত সঞ্চরণ করিতেছেন ; দিবাকর কর্ম্মবলে আলস্য শূন্য হইয়া অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন, চন্দ্রমা কর্ম্মবলে নক্ষত্রমণ্ডলী-পরিবৃত হইয়া মাসার্দ্ধ উদিত হইতেছেন ; হুতাশন কর্ম্মবলে প্রজাগণের কর্ম্ম সংসাধন করিয়া নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ প্রদান করিতেছেন ; পৃথিবী কর্ম্মবলে নিতান্ত দুর্ভর ভার অনায়াসেই বহন করিতেছেন, স্রোতস্বতী সকল কর্ম্মবলে প্রাণিগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া সলিলরাশি ধারণ করিতেছেন ; অমিত বলশালী দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সেই কর্ম্মবলে দশদিক্ ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন এবং অপ্রমত্ত-চিত্তে ভোগবিলাস বিসর্জ্জন ও প্রিয়বস্তু সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভ এবং দম, ক্ষমা, সমতা, সত্য ও ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছেন। ভগবান্ বৃহস্পতি সমাহিত হইয়া ইন্দ্রিয় নিরোধ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি দেবগণের আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রুদ্র, আদিত্য যম, কুবের, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অপ্সরা, বিশ্বাবসু ও নক্ষত্রগণ কর্ম্ম প্রভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন, মহর্ষিগণ ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন।"

"কর্ম্মবাদ কৃষ্ণের পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে প্রচলিত মতানুসারে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডই কর্ম্ম। মনুষ্য জীবনের সমস্ত অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, যাহাকে পাশ্চাত্যেরা Duty বলেন---সে অর্থে সে প্রচলিত ধর্ম্মে "কর্ম্ম" শব্দ ব্যবহৃত হইত না। গীতাতেই আমরা দেখি, কর্ম্মশব্দের পূর্ব্বপ্রচলিত অর্থ পরিবর্ত্তিত হইয়া, যাহা কর্ত্তব্য, যাহা অনুষ্ঠেয়, যাহা Duty, সাধারণতঃ তাহাই কর্ম্ম নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আর এইখানে হইতেছে। ভাষাগত বিশেষ প্রভেদ আছে—কিন্তু মর্ম্মার্থ এক। এখানে যিনি বক্তা, গীতাতেও তিনিই প্রকৃত বক্তা, একথা স্বীকার করা যাইতে পারে।"

"অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের যথাবিহিত নির্ব্বাহের অর্থাৎ (ডিউটির সম্পাদনের) নামান্তর স্বধর্ম্ম পালন। গীতার প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ স্বধর্ম্ম পালনে অর্জ্জুনকে উপদিষ্ট করিতেছেন। এখানেও কৃষ্ণ সেই স্বধর্ম্ম পালনের উপদেশ দিতেছেন। যথা,

'হে সঞ্জয়! তুমি কি নিমিত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি সকল লোকের ধর্ম্ম সবিশেষ জ্ঞাত হইয়াও কৌরবগণের হিতসাধন মানসে পাণ্ডবদিগের নিগ্রহ চেষ্টা করিতেছ? ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বেদজ্ঞ, অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী এবং হস্ত্যশ্বরথচালনে সুনিপুণ। এক্ষণে যদি পাণ্ডবেরা কৌরবগণের প্রাণহিংসা না করিয়া ভীমসেনকে সান্ত্বনা করতঃ রাজ্যলাভের অন্য কোন উপায় অবধারণ করিতে পারেন, তাহা হইলে ধর্ম্মরক্ষা ও পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়। অথবা ইঁহারা যদি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক স্বকর্ম্ম সংসাধন করিয়া দুরদৃষ্টবশতঃ মৃত্যুমুখে নিপতিত হন, তাহাও প্রশস্ত। বোধ হয়, তুমি সন্ধিসংস্থাপনই শ্রেয়ঃ সাধন বিবেচনা করিতেছ, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধে ধর্ম্মরক্ষা হয়, কি যুদ্ধ না করিলে ধর্ম্মরক্ষা হয়? ইহার মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিবে, আমি তাহাই অনুষ্ঠান করিব।'

"তার পর শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্মকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের যেরূপ ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে—এখানেও ঠিক সেইরূপ। এইরূপ মহাভারতে অন্যত্র ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় যে গীতোক্ত ধর্ম্ম এবং মহাভারতের অন্যত্র কথিত কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম এক। অতএব গীতোক্ত ধর্ম্ম যে কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম—সে ধর্ম্ম যে কেবল কৃষ্ণের নামে পরিচিত, এমন নহে—যথার্থই কৃষ্ণ প্রণীত ধর্ম্ম, ইহা একপ্রকার সিদ্ধ।"

বঙ্কিম বাবু এই প্রকার আলোচনার দ্বারা গীতোক্ত ধর্ম্ম যে যথার্থ শ্রীকৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম, তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা তাঁহার ন্যায় গীতাকে প্রক্ষিপ্ত ভাবেন, তাঁহাদেরও গীতোক্তধর্ম্ম যে শ্রীকৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। - শ্রীআশুতোষ দেব।

বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অধ্যায়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

রাজা রঘু রাম রায় দেখিলেন পুত্র সর্ব্ব গুণালঙ্কৃত হইলেন অতএব পুত্রের বিবাহ দিয়া রাজা করিয়া আমি ঈশ্বর স্থানে যাইয়া নিজ কর্ম্মের সাধন করি ইহাই মনোমধ্যে স্থির করিযা সকল সভাসদ জনেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা সকলে বিবেচনা করিয়া উত্তম বংশে পরম সুন্দরী কন্যা স্থির করহ আমি রাজপুত্রের বিবাহ ত্বরায় দিব। সকলেই যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিল পরে অনেকে কন্যার অন্বেষণ করিতে লাগিল শত শত স্থানে মনুষ্য প্রেরিত হইল পরে সকলের বিবেচনায় উত্তম বংশে পরম সুন্দরী কন্যার সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় হইয়া বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন রাঢ় গৌড় বঙ্গ নিবাসী যাবদীয় রাজগণ এবং পণ্ডিতগণ ও প্রধান প্রধান মনুষ্য নিমন্ত্রণ করিলেন বিবাহের দিবস ফাগুণ মাসে স্থির হইল যাবদীয় মনুষ্যের কারণ নানা স্থানে ভাণ্ডার হইল প্রতি ভাণ্ডারে চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চারি প্রকার সামিগ্রী পরিপূর্ণ এবং যে যেমন মনুষ্য তাহারি মত থাকনের স্থান নির্ম্মাণ হইল রাজধানিতে যাবত্ দেশীয় লোক আগমন করিতে লাগিল রাজা আত্ম জনেরদিগের প্রতি আজ্ঞা করিয়া দিলেন তোমরা সর্ব্বদা তত্ত্ব করিবা বিস্তর লোকের আগমন হইতেছে যেন কেহ অভুক্ত থাকে না যে যত লয় তাহাই দিবা। রাজাজ্ঞানুসারে স্ব স্ব কার্য্যে সর্ব্বদা সাবধানে আছে। পরে রাজাগণের আগমন শ্রবণ করিয়া রাজা আপনি প্রত্যেক রাজার নিকটস্থ হইয়া সমাদর পূর্ব্বক উত্তম আলয়ে থাকনের স্থান নিরূপিত করিয়া দিলেন এবং উপযুক্ত মনুষ্য রাজগণের নিকটে নিয়োজিত করিলেন যে যেমন রাজা সেইরূপ সমাদর করেন এবং সামগ্রীর আয়োজন করিয়া প্রেরিত করিলেন পরে রাজা রঘু রাম নগর ভ্রমণ করিয়া মনুষ্য দেখিলেন দেখেন অতিবিস্তর লোক আসিয়াছে এত লোকের খাদ্য সামিগ্রী কি প্রকারে ভৃত্যেরা দিতে পারিবেক অতএব নগরস্থ যাবতীয় খাদ্য সামিগ্রীর দোকান আছে ইহাই আমি ক্রয় করিয়া সকলকে অনুমতি করি যত লয় তাহা দেয় ইহা মনে স্থির করিয়া পাত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন যে রূপ মনুষ্য আসিয়াছে ইহাতে কেহ খাদ্য সামিগ্রী প্রদান করিয়া যশ লইতে পারিবে না কিন্তু যদি কেহ উপবাসী থাকে তবে বড় অখ্যাতি অতএব নগরে যত আহারের দ্রব্যের মহাজন লোক আছে তাহারদিগকে কহ যে যত চাহে তাহাকে তত দেয় এবং যে আপনি লয় তাহাকে বারণ না করে লোক সকল আপন আপন স্বেচ্ছার মত দ্রব্য লউক পরে মহাজনেরদিগের লিপি মত টাকা দিয়া যাইবেক আর ভাণ্ডারের নিয়োজিত লোককে কহ যে যত চাহে তাহার দশ গুণ করিয়া সামিগ্রী দেয় এবং তুমি সর্ব্বত্রে ভ্রমণ করিবা যেন কেহ দুঃখ

না পায়। পাত্র যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিলেন। অসংখ্য মনুষ্যের আগমন হই-য়াছে কোলাহলে নগরের লোক বধির হইল নগরের শোভার সীমা নাই সহস্র সহস্র পতাকা রক্ত পীত শুভ্র নীল ইত্যাদি উড্ডীয়-মানা নানা জাতীয় বাদ্যোদ্যম রাজপুরে মহামহোৎসব অন্য রাজগণ দর্শন করিয়া ধন্য ধন্য করিতেছেন। আর অনেক পণ্ডিত লোক আগমন করিয়া নিজ নিজ স্থানে কাল ক্ষেপণ করিতেছেন। রাজপুরে প্রত্যহ অপূর্ব্ব সভা হয় যাবদীয় রাজগণ এবং পণ্ডিত-গণ এবং প্রধান মনুষ্য সকলেই রাজ সভায় গমন করিয়া স্ব স্ব স্থানে বৈশেন নর্ত্তক নর্ত্তকী শত শত আসিয়া নৃত্য গীত বাদ্য শ্রবণ করায়। এই রূপে প্রত্যহ লগ্ন ক্রমে রাজপুত্রের বিবাহ মহতী ঘটা পূর্ব্বক হইল। পরে মহারাজ রঘু রাম রায় অনাহূত যে সকল লোক আসিয়াছিল তাহারদিগকে মনোনিত ধন দিয়া বিদায় করিলেন সকলে সুখ্যাদি করিয়া আপন আপন দেশে গমন করিল। পরে রাজগণেরদিগকে উপযুক্ত মর্য্যাতা করিয়া বিদায় করিলেন। পণ্ডিতের-দিগকে এবং প্রধান প্রধান মনুষ্যেরদিগকে যে যেমন পাত্র বিবেচনা পূর্ব্বক মর্য্যাদা করিয়া বিদায় করিলেন। সকলেই সুখ্যাতি করিলেক যশে দিগ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। এই প্রকার মহতী ঘটা করিয়া রাজা রঘুরাম কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বিবাহ দিলেন। রাজা রাণী পুত্র এবং পুত্রবধূ প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদে কাল জাপন করিতে লাগিলেন এই রূপে কিঞ্চিত্‌ কাল যায় পরে মহারাজ রঘু রাম রায় কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে রাজ্যে নিযুক্ত করিয়া আপনি ঈশ্বর ভজনে প্রবর্ত্ত হইলেন॥

পরে কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র মত প্রজা পালন করিতে আরম্ভ করিলেন রাজ্যের লোকেরদিগের কোন ব্যামোহ নাই ভৃত্যবর্গেরা নিজ নিজ কার্য্যে প্রাধান্য করিয়া কাল ক্ষেপণ করে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সুখ্যাতির সীমা নাই। তখন রাজ-ধানি মুরসিদাবাদে নবাব সাহেবের নিকট মহারাজার অত্যন্ত সংভ্রম সর্ব্ব প্রকারে মহা-রাজ চক্রবর্ত্তির ন্যায় ব্যবহার॥

এক দিবস মহারাজ পাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে পূর্ব্বে এ বংশে যে সকল রাজ-গণ হইযাছিলেন তাহারা কেহ যজ্ঞ করিয়া-ছিলেন। তাহাতে পাত্র নিবেদন করিল মহারাজ আমরা পুরুষানুক্রমে এ রাজ্যের পাত্র কিন্তু যে সকল মহারাজারা গিয়াছেন আর আর প্রকার সুখ্যাতি করিয়াছেন কিন্তু যজ্ঞ কেহ করেন নাই। মহারাজ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পাত্রকে কহিলেন আমি অতি বৃহদ্‌ যজ্ঞ করিব তুমি আয়োজন কর। পাত্র নিবেদন করিলেন মহারাজ প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরদিগকে আহ্বান করিয়া কি যজ্ঞ করিবেন তাহা স্থির করুন পশ্চাৎ যেমন যেমন আজ্ঞা করিবেন তাহাই করিব। পাত্রের বাক্যে রাজা সর্ব্বত্রে লিপি প্রেরিত করিলেন। ভট্টাচার্য্যেরদিগের আসিতে রাজপুত্র প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা প্রাপ্ত হইয়া মহা হর্ষে রাজধানি কৃষ্ণনগরে আগমন করিলেন।

পরে রাজা শ্রবণ করিলেন যে প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা আমার আজ্ঞানুসারে আগ-মন করিয়াছেন। পাত্রের প্রতি রাজা আজ্ঞা করিলেন অনেক অনেক পণ্ডিতের আগমন হইয়াছে অতএব তাহারদিগকে উত্তম স্থানে বাসা দেহ এবং উত্তম খাদ্য সামিগ্রীও দেহ যেন কোন মতে ব্যামোহ না পান। পাত্র

রাজাজ্ঞামতে যাবদীয় পণ্ডিতেরদিগকে উত্তম স্থান দিয়া খাদ্য সামগ্রী যথেষ্টরূপ দিলেন। পর দিবস রাজা সভা করিয়া পণ্ডিতেরদিগকে আহ্বান করিলেন। পণ্ডিতেরা রাজার বিদ্যমানে আসিয়া মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজ সভাতে বসিয়া নানা শাস্ত্রের বিচার করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। বিচারান-ন্তরে পণ্ডিতেরা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে নিবেদন করিলেন আমারদিগের প্রতি রাজলিপি কি কারণ গিয়াছিল তাহাতে রাজা আজ্ঞা করিলেন আমি মনোমধ্যে বাসনা করিয়াছি যজ্ঞ করিব অতএব আপ-নারা বিচার করিয়া আজ্ঞা করুন কি যজ্ঞ করিব আর কি রূপ করিলে সর্ব্বত্র সুখ্যাতি হইবেক। এই বাক্য ধীরবর্গেরা শ্রবণ করিয়া মহারাজকে নিবেদন করিলেন এ অপূর্ব্ব পরামর্শ করিয়াছেন অদ্য আমরা বাসায় প্রস্থান করি কল্য আসিয়া নিবেদন করিব।

পর দিবস পণ্ডিতেরা আগমন করিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজসভায় সকলে বসিলেন। পরে রাজা পণ্ডিতেরদিগের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন আপনারা কি স্থির করিয়াছেন। পণ্ডিতেরা কহিলেন মহা-রাজ অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী যজ্ঞ করুন। রাজা উত্তর করিলেন দুই যজ্ঞ এককালীন করিব কি পৃথক্ পৃথক্ করিব ইহা বিবেচনা করিয়া আপনারা আমাকে আজ্ঞা করুন এবং কত তঙ্কা হইলে যজ্ঞ সাঙ্গ হইবেক তাহাও আজ্ঞা করুন। পণ্ডিতেরা কহিলেন মহারাজ রাজযজ্ঞ ইহার বিবেচনা মহারাজ করিবেন যজ্ঞের যে যে সামিগ্রীর আবশ্যক তাহার যায় করিয়া দিই। রাজা কহিলেন ভাল তাহাই দিউন। পরে পণ্ডিতেরা রাজসভা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পাত্রের নিকট যাইয়া যজ্ঞের সামিগ্রীর যায় করিয়া দিলেন এবং কহিলেন যে দ্রব্য যজ্ঞেতে লাগিবেক তাহাই আমরা লিখিয়া দিলাম পরে পাত্র সামুদায়িক বরার্দ্দ করিয়া দেখি-লেন বিংশতি লক্ষ তঙ্কা হইলে যজ্ঞ সাঙ্গ হইবেক। মহারাজার নিকটে পাত্র গমন করিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন আয়োজন করহ পরে পাত্র যজ্ঞের দ্রব্য সকল আয়োজন করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন॥

পরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ রাঢ় গৌড় কাশী দ্রাবিড় উৎকল কাশ্মীর প্রভৃতি দেশস্থ যাবদীয় পণ্ডিতের-দিগের প্রতি নিমন্ত্রণের লিপি পাঠাইলেন। যজ্ঞের কাল উপস্থিত হইলেই সকল দেশীয় ধীরবর্গেরা আসিলেন। রাজা অতিশয় ঘটা পূর্ব্বক যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিলেন এবং সকল লোককে যথেষ্ট ধন দিয়া পরিতোষ জন্মাই-লেন। রাজার সুখ্যাতির সীমা নাই যাবদীয় পণ্ডিতেরা রাজার নাম রাখিলেন অগ্নিহোত্রী রাজপেয়ী শ্রীমন্মহা রাজ রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায় এই নাম মহারাজ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দার্ণবে মগ্ন হইলেন। পশ্চাৎ যাবদ্দেশীয় পণ্ডিতেরদিগকে বহুবিধ ধন দিয়া বিদায় করিয়া মনের হর্ষে রাজ্য করেন। রাজ্য শাসিত হইলে সর্ব্বত্র সুখ্যাতি পাই-লেন। প্রজা সকলের যথেষ্ট আহ্লাদ কোন রূপে ব্যামোহ নাই। এইরূপে কাল ক্ষেপণ করেন।

এক দিবস অন্তঃকরণে হইল শিকারে যাইব পরে ভৃত্যবর্গেরদিগকে আজ্ঞা করি-লেন আমি মৃগয়া করিতে যাইব তোমরা সকলে সসজ্য হও আজ্ঞা প্রমাণে সকলে

প্রস্তুত হইল। রাজা অশ্বারোহণে গমন করিয়া নিবিড় বনে মৃগয়া করেন। ইতি-মধ্যে এক স্থানে উপনীত হইয়া দেখেন অতিরম্য স্থান চারিদিগে নদী মধ্যে এক ক্ষুদ্রদ্বীপ এবং স্থানে স্থানে অনেক পশু পক্ষী আছে নানা প্রকার শব্দ হইতেছে। রাজা স্থান নিরীক্ষণ করিলেন এ অপুর্ব্ব স্থান আমি এইখানে কিছু দিন বিশ্রাম করিব। রাজাজ্ঞা ক্রমে ভৃত্যবর্গেরা রাজার থাকিবার উপযুক্ত স্থান করিয়া দিয়া পশ্চাৎ আপনারদিগের স্থান করিয়া সকলেই সেই স্থানেঃ বাস করেন। পরে রাজা আজ্ঞা করিলেন আমি এই স্থানে পুরী নিম্মাণ করিব পাত্রকে শীঘ্র আনয়ন কর। রাজা-জ্ঞানুসারে দূত গিয়া পাত্র আনিল পাত্রকে দেখিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন তুমি এই স্থানে অপূর্ব্বা এক পুরী প্রস্তুতা কর যেন কোন রূপে কেহ নিন্দা না করে। পাত্র নিবেদন করিলেন মহারাজ আপনি রাজধানিতে গমন করুন আমি পুরী নিম্মাণ করাই পশ্চাৎ প্রস্তুতা হইলেই মহারাজ আসিয়া দেখিবেন। পাত্রের বাক্যে রাজা রাজধানিতে আগমন করিলেন পাত্র সেই স্থানে থাকিয়া পুরী নির্ম্মাণ করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। চারি দিগে যে নদী আছে সেই গড় হইল। দক্ষিণ দিগের নদী বন্ধন করিয়া প্রধান পথ করিলেন এবং সৈন্তের থাকনের স্থান করিলেন বড় বড় কামান দুই পার্শ্বে রাখিলেন হটাৎ পুর মধ্যে শত্রু প্রবেশ করিতে না পারে তৎপরে অপুর্ব্ব অট্টালিকা তৎপরে বাদ্যো-দ্যম তার পরে অতি উচ্চ অট্টালিকা তাতে ঘড়ি তদূর্দ্ধে ঘণ্টা তার পর চারি দরজা মধ্যে সদাগরেরদিগের থাকনের স্থান এবং হাট নানা জাতীয় দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হইবেক তন্মধ্যে বিস্তারিত পথ কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া এক অট্টালিকা তাতে নানা জাতীয় যন্ত্র লইয়া যন্ত্রীরা বাদ্যোদ্যম করি-বেক পরে রাজবাটী প্রথম এক চতুঃসীমা দক্ষিণ দ্বারী এক অট্টালিকা তাহাতে রাজ-কীয় ব্যাপার হইবেক। তিন পার্শ্বে অট্টালিকা তাতে ভৃত্যেরা থাকিবে। পরে এক চতুঃসীমা তাতে ঈশ্বরের আলয় অপুর্ব্ব রম্য স্থান সহস্র সহস্র লোকে দর্শন করিতে পারে। পরে একখান পুরী তাতে মহা-রাজার বিরাজ করণের স্থান। চারি দিগে অট্টালিকা পরে অন্তঃপুর অতি বৃহৎ বাটী নানা স্থানে নানা প্রকার অট্টালিকা। অন্তঃপুরের কিঞ্চিৎ দূরে এক পুষ্পোদ্যান চতুর্দ্দিগে প্রাচীর মহারাণী প্রভৃতি পুষ্পো-দ্যানে গমন করিতে পারেন পুষ্পোদ্যানে নানা জাতীয় পুষ্প তন্মধ্য স্থানে এক অট্টালিকা তাহাতে বসিয়া রাণী নৃত্যকীর-দিগের নৃত্য দর্শন করেন এবং গীত বাদ্য শ্রবণ করেন। পশ্চিম দিগের যে পথ সেই পথ দিয়া কিঞ্চিৎ গমন করিলে এক ধর্ম্মশালা সেখানে অন্ধ অতুর পঙ্গু এবং উদাসীন যে কেহ উপনীত হইবেক যার যে স্বেচ্ছা আহারের দ্রব্য পাইবেক ভাণ্ডার পরিপুর্ণ করিয়া দ্রব্য রাখি-লেন॥

পুর্ব্বদিগে এক অপুর্ব্ব পুষ্পোদ্যান তার মধ্য স্থানে অট্টালিকা এবং নানা জাতীয় বৃক্ষ ও পুষ্প এই পুষ্পোদ্যানের পর যাবদীয় মহা-রাজার জ্ঞাতি এবং কুটুম্বদিগের পৃথক পৃথক অট্টালিকাময়ী বাটী প্রত্যেক বাটীতে দেবা-লয়, এইরূপ অনেক প্রকার বাহুল্য করিয়া বাটী প্রস্তুত করিলেন। পরে পাত্র বাটী

নির্ম্মাণ করাইয়া মহারাজাকে সংবাদ দিলেন যে বাটী প্রস্তুত হইয়াছে। মহারাজ সপরিবারে নূতন বাটীতে আগমন করিয়া সকল পুরী দেখিয়া অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া পাত্রকে রাজপ্রসাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন অধ্যাপকেরদিগের স্থান করিয়াছ। পাত্র নিবেদন করিলেন মহারাজার যে পুষ্পের বাগান হইয়াছে তাহার নিকট স্থান আছে আজ্ঞা করিলে সেই স্থানে প্রস্তুত করি। রাজা কহিলেন অতি শীঘ্র প্রস্তুত করহ। রাজাজ্ঞানুসারে পৃথক পৃথক পাঠশালা প্রস্তুত করাইলেন। সেই সকল পাঠশালায় প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা বসতি করিয়া অধ্যাপনা করাইতে লাগিলেন এবং নানা দেশীয় গুণবান লোক আসিয়া গুণ শিক্ষা করান এবং করে। রাজা শুভক্ষণে পুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, আহ্লাদের সীমা নাই। পুরীর নাম শিবনিবাস নদীর নাম কঙ্কনা রাখিলেন। পুরবাসী যাবদীয় মনুষ্যেরা মহা সুখে সর্ব্বদা হাস্য পরিহাস্যতে কালক্ষেপণ এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান ঈশ্বরের আরাধনা করেন। এইরূপে মহারাজ বসতি করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। মধ্যে মধ্যে রাজা মুরসিদাবাদে গমন করিয়া নবাব সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথেষ্ট শিষ্টাচার করেন এবং নানা জাতীয় ভেটের দ্রব্য নবাবকে দেন। তখন নবাব আলাবৃদ্ধি খান অতিবড় ধর্ম্মাত্মা সকলের প্রতি দয়ালু পুণ্যশীল সকল রাজারা রাজকর নবাবকে দিয়া সুখেতে কালক্ষেপণ করিতেছেন। রাজ্যোৎপাত কাহারু নাই যে যেমন মনুষ্য তাহাকে সেইরূপ নবাবের কৃপা কিন্তু নবাব সাহেবের পুত্র নাই এক কন্যা কন্যার প্রতি নবাব সাহেবের অতিশয় স্নেহ। কিছু কালান্তরে নবাব সাহেবের এক দৌহিত্র হইল নাম রাখিলেন স্রাজেরদৌলা নবাব সাহেবের বাসনা দৌহিত্র সর্ব্বদাই নিকটে থাকে এইরূপে কিছুকাল যায় স্রাজেরদৌলা অতি বড় দুর্ব্বৃত্ত হইলেন যাহা মনে আইসে তাহাই করেন কেহ বারণ করিতে পারে না। নবাব সাহেবের পাত্র মহারাজ মহেন্দ্র এবং আর আর প্রধান প্রধান চাকর অনেক আছে সকলেই ঐক্য হইয়া নবাব সাহেবকে নিবেদন করিলেন স্রাজেরদৌলার অতিশয় দৌরাত্ম্য করিতেছেন ইহার আপনি উপায়ান্তর করুন তার পর নবাব সাহেব স্রাজেরদৌলাকে ডাকাইয়া কহিলেন তুমি যাবদীয় লোকের উপর দৌরাত্ম্য করহ এ অতি মন্দ কর্ম্ম সাবধান কদাচ মন্দ ক্রিয়া করিও না। এইরূপ শাসিত করনে স্রাজেরদৌলা প্রধান পাত্রগণেরদিগকে আহ্বান করিয়া দমন করিলেক আমি যে কার্য্য করি তাহা যদি নবাব সাহেবের গোচর হয় তবে তোমারদিগের যথেষ্ট দণ্ড করিব এবং একথা নবাব সাহেবের নিকট তোমরা কহিয়াছ যদি আমার নবাবি হয় তবে ইহার প্রতিফল সুন্দরমতে দিব যত প্রধান প্রধান ভৃত্যেরা মহাসঙ্কান্বিত হইয়া নীরব হইলেন। তারপর স্রাজেরদৌলা নানা প্রকারে দৌরাত্ম্য করিতে আরম্ভ করিলেক নদী দিয়া নৌকা যায় সে নৌকা ডুবায় মনুষ্য সকল ডুবে মরে ইহাই দেখে এবং যাহার আলয়েতে শুনে পরম সুন্দরী কন্যা আছে বলক্রমে সে কন্যা হরণ করে ও গর্ব্ভিণী স্ত্রী আনিয়া উদর চিরিয়া দেখে কোন খানে সন্তান থাকে এইরূপ অতিশয় দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। সকল লোক বিবেচনা করিতে প্রবর্ত্ত হইল পরস্পর বিবেচনা করিলেন এ দেশে আর থাকা পরামর্শ নহে নগরস্থ লোক সকল মুরসিদা-

বাদ ত্যাগ করিয়া পলায়ন পর হইল হাহাকার শব্দ উঠিল সকল লোকেই ঈশ্বরের স্থানে আরাধনা করিতে প্রবর্ত্ত হইল যেন এ দেশে জবন অধিকারী না থাকে। কিছু দিন যায় নবাব আলাবৃদ্ধির লোকান্তর হইলে স্রাজেরদৌলা নবাব হইলেন। যাবদীয় প্রধান প্রধান ভৃত্যবর্গেরা ভেট দিয়া করপুটে নিবেদন করিলেন আপনি এখন এ দেশের কর্ত্তা হইলেন যাহাতে রাজ্যের লোকে সুখী হয় তাহা করিবেন ঈশ্বর আপনকারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিলেন এ দেশের লোককে সুখে রাখিলে বহুকাল রাজ্য করিতে পারিবেন। এই প্রকার পাত্র মিত্র লোকে সর্ব্বদা বুঝান কিন্তু তিনি দুষ্ট প্রকৃতি ত্যাগ ও উত্তম বাক্য শ্রবণ করেন না সকল লোক এবং প্রধান প্রধান চাকরেরা বিবেচনা করিলেন স্রাজেরদৌলা নবাব থাকিলে কাহারো কল্যাণ নাই অতএব কি হইবে কোথা যাব ইহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না পরে যাবত্ দেশীয় রাজা ঐক্য হইয়া নবাবের প্রধান পাত্র মহারাজ মহেন্দ্রকে নিবেদন করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। রাজা সকলের নাম বর্দ্ধমানের রাজা ও নবদ্বীপের রাজা দিনাজপুরের রাজা বিষ্ণুপুরের রাজা মেদনীপুরের রাজা বীরভূমের রাজা ইত্যাদি করিয়া সকল রাজগণ প্রধান পাত্রের নিকট যাত্রা করিয়া স্রাজেরদৌলার দৌরাত্ম্য নিবেদন করিলেন। মহারাজ মহেন্দ্র সকলকে আশ্বাস দিয়া স্ব স্ব রাজ্যে প্রেরিত করিলেন।

পরে যাবদীয় মন্ত্রীরা নবাব স্রাজেরদৌলায় নীতি শিক্ষা করান যত উত্তম কথা কহেন স্রাজেরদৌলা ততোধিক মন্দ করে। পরে মহারাজ মহেন্দ্র এবং রাজারাম নারায়ণ রাজা রাজবল্লভ রাজা কৃষ্ণদাস ও মীর জাফরালি খান এই সকল লোক ঐক্য হইয়া এক দিবস জগত্ সেট মহাশয়ের বাটীতে গমন করিয়া জগৎ সেটের সহিত বিরলে বসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। মহারাজ মহেন্দ্র অগ্রে কহিলেন আমি যাহা কহি তাহা তোমরা শ্রবণ করহ আমরা এদেশে অনেক কালাবধি আছি এবং নবাব সাহেবদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া প্রাধান্য রূপে পুরুষানুক্রমে কালক্ষেপণ করিতেছি এখন যিনি নবাব হইলেন ইহার নিকট মানের লঘুতা দিন দিন হইতে লাগিল আর সকল লোকের উপর অতিশয় দৌরাত্ম্য কত রূপে বিষেধ করিলাম এবং বুঝাইলাম তাহা কদাচ শুনে না আর দৌরাত্ম্য করে অতএব ইহার উপায় কি সকলে বিবেচনা করহ। রাজা রামনারায়ণ কহিলেন ইহার উপায় হস্তিনাপুরে জনেক গমন করিয়া এ নবাবকে তগির করিয়া অন্য এক নবাব না আনিলে এ রাজ্যের কল্যাণ নাই। রাজা রাজবল্লভ কহিলেন এ পরামর্শ কিছু নয় হস্তিনাপুরের বাসনা জবন তিনি আর একজন নবাব দিবেন সেও জবন অতএব জবন অধিকারী থাকিলে হিন্দুর হিন্দুত্ব থাকিবেক না। এইরূপ কথোপকথন স্থির কিছুই হয় না শেষে এই পরামর্শ হইল যাহাতে জবন দূর হয় তাহার চেষ্টা করহ ইহাতে জগৎসেট কহিলেন এক কার্য্য করহ নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অতি বড় বুদ্ধিমান তাহাকে আনিতে দূত পাঠাও তিনি আইলেই যে পরামর্শ হয় তাহাই করিবে। সকলে সত্য কহিয়া দূত প্রেরণ করিয়া নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন।

ক্রমশঃ।

বৈতালিক।

১

জাগ জাগ জননী আমার!
দীপক রাগেতে কুজে বিহঙ্গ,
নিভিছে তারা, নিভিছে চন্দ্র
মুছায়ে অন্ধকার।
এনেছি গাঁথিয়া পরাতে চরণে
নবীন পুষ্পহার,
জাগ জাগ জননী আমার!

২

জাগ জাগ জননী আমার!
ভেঙ্গেছিল তব নিদ্রা নিশীথে,
হেরেছ আঁধার মাগো, চারিভিতে,
পোহায় নি ভাবি' রজনী তখনো
জড়ায়ে স্বপন ভার,—
মুদেছ নয়ন আবেশ-কাতর
পুনঃ পুনঃ কতবার।
জাগ জাগ জননী আমার!

৩

জাগ জাগ জননী আমার!
অরুণ কিরণ মণ্ডিত শিরে,
হীরক কীরীটী তুলে পর ধীরে,
বোধন-তূর্য্যধ্বনি মুহুর্মুহু,
কাঁপে বিশ্ব পারাবার!
পুলক-পূরিত বিজয়-নিনাদে
ছুঁয়েছে আকাশ দ্বার!
জাগ জাগ জননী আমার!

৪

জাগ জাগ জননী আমার!
শত প্রার্থনা, সহস্র কর্ম্মে
ভরে বসে আছে মর্ম্মে মর্ম্মে
হেম সিংহাসন ঘেরি' রাজসভা
প্রতীক্ষায় মা তোমার,—
ভক্ত প্রজার আসন্ন গতি,
অগতি উপহার!
জাগ জাগ জননী আমার।

৫

জাগ জাগ জননী আমার!
স্নেহ-স্তন্য-অন্ন-লালিত
বিদ্রোহী প্রাণ ছিল অবিনীত,
এতদিন তাই এ উপদ্রবে
হইয়াছি ছার খার!
অরাজক দেশ নহি শুধু তুমি,
প্রজা মোরা মা তোমার!
জাগ জাগ জননী আমার।

৬

জাগ জাগ জননী আমার!
তব প্রাপ্য দিয়েছি অপরে,
না জানি কে রাজা, আজি তোর তরে,
এ শতাব্দীর বাকী রাজকর,—
আনিয়াছি সবাকার,—
সভার মাঝারে সবার প্রাণের
ভকতি ও অশ্রুধার—
জাগ জাগ জননী আমার।

শ্রীধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী।

যোগী রামানন্দ।

এই জগদরণ্যের কত স্থানে যে কত দেববাঞ্ছিত কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া স্বকীয় পবিত্র পরিমলে কাননের এক প্রান্তমাত্র সুবাসিত করিতে না করিতেই কালের তীব্র নিশ্বাসে বিশীর্ণ হইয়া বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান কর, জানিতে পারিবে, ঈদৃশ লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প।

আমরা যে মহাপুরুষের পরিচয় দানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনি প্রকৃতপক্ষেই নন্দনচ্যুত পারিজাত ছিলেন। তাঁহার স্বর্গীয় সৌরভে, অল্পদিনের জন্য নিতান্ত পূতিগন্ধময় নরকও আমোদিত হইয়াছিল, এবং তাঁহার মধুর ভাবের যাদুমন্ত্রে পাষাণখণ্ডেও পঙ্কজ বিকসিত হইয়াছিল, এবং যাহাদের মরুময় প্রদেশেও শান্তিময়ী শৈবলিনী প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল। সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের নাম ৺ অন্নদাচরণ চৌধুরী, ইনি ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালীপাড়ার মদনপাড় গ্রামে প্রসিদ্ধ সাড়ে আট আনী বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইঁহার পিতার নাম গোপীমোহন চৌধুরী, অন্নদাচরণ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র। বাল্যেই ইনি পিতৃহীন হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার তত্ত্বাবধানে রক্ষিত ও প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। প্রথমে গুরুর পাঠশালায়, তৎপরে চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত ব্যাকরণের ধাতু রূপ পর্য্যন্ত পাঠেই তাঁহার শিক্ষা পর্য্যবসিত হইয়াছিল। উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে কিম্বা কুসংসর্গ প্রভাবে, অন্নদাচরণের যৌবনের প্রথমাবস্থা নিতান্ত কলুষিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তথাপি পরহিতৈষণা, বদান্যতা, মাতৃভক্তি ও পুরুষোচিত উৎসাহ ও তেজস্বিতায় তিনি আদর্শ স্থানীয় ছিলেন। তিনি কঠোর কর্ত্তব্য প্রতিপালনে ও প্রতিজ্ঞা পরিরক্ষণে বজ্রাপেক্ষাও কঠিন এবং পরদুঃখ দর্শনে কুসুমাপেক্ষাও সুকোমল ছিলেন। যৌবনাবসানের পূর্ব্বেই তাঁহার হৃদয়ের মসীময়ী যবনিকা উত্তোলিত হইল, তিনি আপাতমধুর ও পরিণামতাপী বিষয়-ভোগ ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অন্নদাচরণের চিত্ত পরিবর্ত্তনের অল্প দিন পূর্ব্বে একটী লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইল। সেই ঘটনার সূত্রাবলম্বনেই অন্নদাচরণের হৃদয়ে স্বর্গীয় জ্যোতি প্রতিফলিত হয়। ভগবান যে কোন সূত্রে কাহার প্রতি করুণাময়ী পীযূষ-ধারা বর্ষণ করিয়া থাকেন, তাহা মানব-বুদ্ধির অগোচর।

১২৯১ সালের মাঘ মাসে মদনপাড়ের সংলগ্ন সোনাটিয়া গ্রামের কোনও মুসলমান, তাহার মাতৃ-কৃত্যোপলক্ষে গোহত্যা করিতে কৃত-নিশ্চয় হইল। স্থানীয় জমীদারগণ এই সংবাদ অবগত হইয়া, দল বলসহ, গোহত্যা নিবারণোদ্দেশে সোনাটিয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য যে, অন্নদাচরণও তাহাদের অন্যতম ছিলেন। রজনী যোগে, মুসলমান বাড়ী আক্রমণ পূর্ব্বক হত্যার্থ আনীত গো সমূহের উদ্ধার সাধন হইল। মুসলমানগণ ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া, ক্রোধান্বিত হইল এবং ভীষণ লড়াই আরম্ভ করিল। হিন্দু মুসলমান উভয় দলের ২।৩ জন আহত হইল। অন্নদাচরণও মুসলমান কর্ত্তৃক বিশেষরূপে

লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইলেন। রাত্রি প্রভাত হইল, জমীদারগণ, মুসলমান-শাসনে বদ্ধ-পরিকর হইয়া নানাবিধ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। বহু সংখ্যক মুসলমান বাড়ী ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিল। কয়েক মাস যাবৎ এই প্রকার চলিল, পরে অর্থ দণ্ড দানে মুসলমানগণ জমীদারগণের ক্রোধানল নির্ব্বাপিত করিল, কিন্তু তদবধি অন্নদাচরণের হৃদয়ে, কি যেন, এক ভীষণ অনল প্রজ্বলিত হইয়া, তাঁহাকে অহরহ দগ্ধ করিতে লাগিল। কোনও প্রকার পার্থিব সান্ত্বনায় তাহার নির্ব্বাণ হইল না। নিরন্তর মুর্ম্মুর দাহে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল, এ অনল ক্রোধ বা প্রতিহিংসা-সম্ভূত নহে যে সত্বর শান্তি লাভ করিবে, ইহা পূর্ব্বানুষ্ঠিত জুগুপ্সিত কার্য্যের পশ্চাত্তাপ-সম্ভূত। যবন হস্তে তাদৃশ লাঞ্ছনা ভোগ, তিনি সেই সকল যৌবন-কৃত পাপের পরিণাম ফল মনে করিয়া, নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাদৃশ অনুতাপানলের ভীমদাহে, অন্তরের অনবরত অশ্রুধারা সিঞ্চনে আবর্জ্জনা রাশি ভস্মীভূত হইল এবং অল্পে অল্পে সেই উর্ব্বরক্ষেত্রে, বিবেক-বীজ অঙ্কুরিত হইল। মাটীর অন্নদাচরণ ক্রমে ক্রমে দেবত্বে উন্নীত হইতে লাগিলেন। কিন্তু অন্নদাচরণের সেই প্রফুল্ল মুখশ্রী, নিদাঘ-তাপ-বিশীর্ণ কুসুমের ন্যায়, ম্লান ভাব ধারণ করিল, অনবরত অশ্রুপাতে তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। তিনি বালকের ন্যায় রোদনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের নিকট স্বকৃত পাপকাহিনী বিবৃত করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

যে সকল মুসলমানগণ, অন্নদাচরণের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রতি তিনি কোনও প্রকার প্রতিহিংসা করেন নাই। বরং দয়া ও ক্ষমাগুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "মুসলমানগণ, অত্যাচারচ্ছলে, আমার পরমোপকার সাধন করিয়াছে, উহারা আমার পরম বন্ধু, তাই আমাকে মোহময়ী নিদ্রা হইতে জাগরিত করিয়াছে। সর্ব্বমঙ্গলময়ী জননী অবশ্যই উহাদের মঙ্গল বিধান করিবেন।" একদিন অত্যাচারকারী কোনও মুসলমান অন্নদাচরণকে সহসা সম্মুখে দেখিতে পাইয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছিল, অন্নদাচরণ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া সজলনেত্রে বলিলেন, "ভাই! লজ্জা কি? মনুষ্য আপন ইচ্ছায় কোনও কার্য্য সম্পাদন করে না, দুনিয়া দারির সক [illegible] একমাত্র খোদা তালার হুকুম তামিল করিয়া থাকে, ইহাতে তোমাদের লজ্জা বা ভয়ের কোনও কারণ নাই। ভাই! একবার "আল্লা আল্লা" বলিয়া আমাকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন কর। আমি সম্বল-বিহীন কাঙ্গাল, কাঙ্গালের কাতর প্রাণে ব্যাথা দিয়া তোদের ফল কি?"

মহাপুরুষ অন্নদাচরণের, ঈদৃশ অলৌকিক দৈন্য ভাব ও প্রেম-পরতন্ত্রতা কেবল সম্প্রদায় বিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল না, তাঁহার প্রেম, সার্ব্বজনীন ও সর্ব্বসুলভ ছিল। পূর্ব্বোক্ত আশ্চর্য্যকর ঘটনাই তাঁহার দেবোচিত মধুর ভাবের প্রথম নিদর্শন।

প্রহ্লাদ ও মহাপ্রভু চৈতন্য প্রভৃতি কতিপয় প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের জীবনে ব্যতীত ঈদৃশ ক্ষমা ও মধুর ভাব প্রায়ই পরিদৃষ্ট হয় না। ধন্য অন্নদাচরণ, ধন্য তুমি, ধন্য তোমার প্রেম, তুমি মাটীর মানুষ হইয়াও আজ স্বর্গীয় দেবতা, তোমার পূত পদধূলি অঙ্গে ধারণ

করিতে পারিলে, না জানি কত পুণ্য সঞ্চয় হইত।

অন্নদাচরণের ঈদৃশ ভাব দর্শনে, কেহ কেহ তাহাকে নিন্দা করিতে লাগিল, কেহ বা বাতুল বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে ও অশ্রুপ্লাবিত কপোলে, সকলের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন "ভগবান সর্ব্বভূতস্থ, তাঁহার মহাশক্তিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রী, সর্ব্বভূতেই তাঁহার অধিষ্ঠান সমানরূপে অবস্থিত, সুতরাং সকলেই, আমার নমস্য পূজার্হ। যদি অজ্ঞানতাবশতঃ কাহারও প্রতি অবজ্ঞা বা কাহারও প্রাণে কোনও ব্যথা দিয়া থাকি, তবে এই দীনহীন কাঙ্গালকে পদধূলি দানে, সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন।"

"তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

মহাপ্রভুর এই বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম, অন্নদাচরণ, সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, তাই আজ তিনি, বিদ্যা-সম্পন্ন লোক হইয়াও কাঙ্গাল, এবং তৃণ অপেক্ষাও নিজকে লঘু মনে করিতে লাগিলেন। জাত্যভিমান, কুলাভিমান প্রভৃতি সমস্ত অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া, সকলকে নমস্য ও পূজার্হ বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন। তত্রাবস্থায় তিনি যদি হরিনামের প্রকৃত অধিকারী না হন, তবে আর কে হইতে পারে?

অন্নদাচরণের দুঃখ-দুর্দ্দিনাচ্ছন্ন হৃদয়ে অল্পে অল্পে সুধাংশুর সুধাময় কিরণজাল নিপতিত হইতে লাগিল। তিনি ক্রমে ক্রমে সাংসারিক সুখভোগে জলাঞ্জলি দিয়া চিত্ত পরিশুদ্ধি-কামনায়, গুরুর উপদেশ ক্রমে, কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন। সাধারণের শ্রদ্ধাদত্ত মুষ্টিভিক্ষার অন্নই তাঁহার এক মাত্র জীবনোপায় হইল। বেদ-বিহিত ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠানে তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য কাল অতিবাহিত হইত। সম্বৎসরস্থায়ী ব্রহ্মচর্য্যের অবসানে, বাঞ্ছিত ফলের প্রত্যাশায়, অন্নদাচরণ ৺ কাশীধামে যাত্রা করিলেন। তথায় কোনও মহাপুরুষের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া কোনও গিরিগহ্বরে মহাসাধনায় নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার চিত্ত সংযম ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ পরীক্ষার্থ নানা প্রকার পাপময় প্রলোভন প্রদর্শিত হইল, তিনি নির্ব্বিকার চিত্তে ধ্যান নিমগ্ন রহিয়া ভীষণ অগ্নিময়ী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

"বিকার হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে।
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ॥

যোগী অন্নদাচরণ মহাকবি কালিদাসের এই মহাবাক্যের জলন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইলেন। পার্ব্বত্য দংশ ও মশকগণের দংশন, বৃশ্চিক ও মূষিকগণের উপদ্রব এবং দীর্ঘকাল অনশন, ইহার কিছুতেই যোগী অন্নদাচরণের মহাযোগ ভঙ্গ করিতে পারিল না।

"আত্মেশ্বরাণাম নহি জাতু বিঘ্না,
সমাধি ভঙ্গ প্রভবো ভবন্তি"

এই বাক্যের চরম সত্যতা, যোগী অন্নদাচরণের মহাযোগে অধিকতর পরিস্ফুট হইল। অন্নদাচরণ, ঈদৃশ চিত্ত সংযম ও কর্ম্মসহিষ্ণুতায় গুরুর নিতান্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন, এবং ভগবানের কৃপায় কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি নানা প্রকার যোগ-কৌশল শিক্ষা করিয়া, গুরুর উপদেশ ক্রমে, স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই সময়েই গুরু তাঁহাকে "রামানন্দ" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। জন্মান্তরীন সুকৃত ফলে অন্নদাচরণ, অতি অল্প দিনের মধ্যেই, বাঞ্ছিত ফল লাভে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

সাড়ে আট আনা জমীদার বংশের পূর্ব্ব পুরুষ প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক ৺ কৃষ্ণরাম চক্রবর্ত্তীর তপোমন্দিরের ভগ্নাবশেষ প্রকাণ্ড অশ্বথ-পাদপ-গ্রস্ত ও নানাবিধ গুল্ম লতা সমাচ্ছন্ন ছিল। অন্নদাচরণ, স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া,বহু পরিশ্রমে সেই পবিত্র স্থান পরিষ্কৃত করিলেন, এবং অশ্বথ মূলে একটী গর্ত্ত খনন করিয়া তথায় স্বকীয় নৈশ সাধনার স্থান নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি দিবা যোগে, প্রায়ই প্রখর মার্ত্তণ্ড-কর-সন্তপ্ত-প্রান্তরে কখনও বা জল মধ্যে বসিয়া মহাযোগে নিমগ্ন হইতেন। নিদাঘের ভীষণ সন্তাপ, বর্ষার বারিধারা কিম্বা শীতের প্রবল আক্রমণ, ইহার কিছুতেই অন্নদাচরণের যোগ ভঙ্গ করিতে পারে নাই।

"যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে, পুরুষং পুরুষর্ষভ,
সম দুঃখ সুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে।

অন্নদাচরণ, আজ দ্বন্দ্বাতীত, সুখদুঃখ তাঁহার সমান এবং তিনি সংযত-চিত্ত ও ধীরভাবে মহা সাধনায় নিমগ্ন, ভগবদ্গীতার বাক্যানুসারে তিনি যে মোক্ষলাভের সম্পূর্ণ উপযোগী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অত্রাবস্থায় রামানন্দের আচার ব্যবহার বা খাদ্যাদির বিশেষ কোনও নিয়ম ছিল না, কিম্বা কোনও জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যেও আবদ্ধ ছিল না, যজ্ঞসূত্রও যথাবিধি বহন করিতেন না। সাধারণে তাঁহাকে শাক্ত বলিয়া জানিত, কিন্তু তাঁহার সাধনা প্রথমে তন্ত্র বিহিত পদ্ধতি অনুসারে সম্পাদিত হইলেও পরে তন্ত্রের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল, সমস্ত ধর্ম্মেই তাঁহার সমানুরাগ দৃষ্ট হইত। কখন বা 'আল্লাহ' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতেন। আবার কোনও সময়ে বা যীশুর নামে উন্মত্ত হইতেন। তিনি নানা সম্প্রদায়ের নানা প্রকার সঙ্গীতেই আনন্দিত হইতেন। নিজে কোনও গানই সম্পূর্ণ রূপে গাহিতে বা সুস্থ চিত্তে শ্রবণ করিতে পারিতেন না, ভগবৎসঙ্গীতে তিনি প্রায়ই আত্মহারা হইয়া মহাভাবে নিমগ্ন হইতেন, এই পদ কয়েটী তাঁহার মুখে প্রায়ই পরিশ্রুত হইত—

"ধর্ত্তে পারোনা পাগলের বুলি,
বৃথা কেন পাগল হলি"
"ভেবে মরি কি সম্পর্ক তোমার সনে—
তত্ত্ব তার না পাই বেদ পুরাণে"

ইত্যাদি।

অন্নদাচরণ, প্রতিদিন, সায়ংকালে তাঁহার সেই নৈশ সাধনা স্থানের সংলগ্ন শীতলাতলায় নানাবিধ স্তোত্র পাঠ করিতেন, এবং ধর্ম্ম বিষয়ক নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করিতেন। তথায় গ্রামবাসী বহু লোক সমবেত হইয়া, তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিত। তিনি বলিতেন "এই সংসার ভগবানের রঙ্গালয়, জীব মাত্র তাঁহার অভিনেতা, তিনি যে ভাবে যাহাকে সাজাইয়াছেন, সে সেই ভাবে সাজিয়াছে। তুমি, আমি, নিজের প্রতি কর্ত্তৃত্ব চাপাইয়া কেবল দুঃখের ভার বহন করিয়া থাকি। তাঁহার রাজ্য,কার্য্যও তাঁহার, তুমি আমি "আমার আমার" বলিতে কে? সকলেই এক মহাজননীর সন্তান, সকলেই পরস্পর ভ্রাতৃভাবে সম্পর্কিত, বৃথা কেন দ্বেষ, অভিমান ও ঘৃণা প্রকাশ করিয়া জননীর আদেশ লঙ্ঘন কর? নীচ বলিয়া কাহাকেও অবজ্ঞা করা মহাপাপ, সংসারে কেহই নীচ নয়, সকলেই এক মাতার গর্ভজাত। স্ত্রী জাতির প্রতি, কখনও অন্যায় বা অবিচার করিও না। উঁহারা মা, এবং দয়া, দাক্ষিণ্য ও বাৎসল্য প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি। জগজ্জননী মহাশক্তির পূততম অংশ, যে স্থানে

স্ত্রী জাতি লাঞ্ছিত বা নিগৃহীত হয়, সে স্থান মহাশ্মশান, সেখানে সুখ বা শান্তির কুসুম কখনও প্রস্ফুটিত হয় না। বৎসভাব অবলম্বন কর, শিং উঠিয়া থাকে, উহা ভাঙ্গিয়া বাছুর হও, "মা, মা", বা হাম্বারবে আকুল প্রাণে ডাকিতে থাক, অবশ্যই মায়ের সাক্ষাৎ পাইবে। মা শব্দ সাধনার সার। মা বলিয়া আকুল প্রাণে রোদন ব্যতীত অন্য সাধনা নাই, মন্ত্র নাই, যাগ, যজ্ঞ, জপ, তপ কিছুই নাই। ধ্যান ধারণা যাহা কিছু বল, সকলই 'মা', পাপ পুণ্য, সত্য মিথ্যা, সুখ দুঃখ প্রভৃতি মায়ের পবিত্র পদে উৎসর্গ করিয়া দাও, তাঁহার রাজ্য, তাঁহার কার্য্য, পলকের জন্যেও একথা বিস্মৃত হইও না।

আপিঙ্গল জটাজুটধারী, বিভূতি-বিভূষিত-গাত্র, কৌপীন-পরিহিত, শালপ্রাংশু যোগী রামানন্দ, যে সময়ে অভ্রভেদী ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া ভক্তি গদগদ কণ্ঠে উপদেশ প্রদান করিতেন, সে সময়ে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের হৃদয়ে কি যেন এক অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় মধুর ভাবের আবির্ভাব হইত। অল্পদিনের মধ্যেই গ্রামবাসী অনেক লোকের শুষ্ক হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠিল, বৃথা পরনিন্দা ও কুকথার প্রসঙ্গ ছাড়িয়া অনেকেই সৎপথে ও সাধুভাবে চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহা বেশী দিন স্থায়ী হইল না,—অন্নদাচরণের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা স্মৃতি মাত্রে পর্য্যবসিত হইল।

মদনপাঁড়ে ও তৎনিকটবর্ত্তী গ্রামে চৈত্র মাসে বিসূচিকা (কলেরা) রোগের আবির্ভাব হইল, বহুলোক কালগ্রাসে নিপতিত হইল, গ্রামের সর্ব্বত্রই হাহাকার, সকলের প্রাণেই নিরতিশয় ভয়ের সঞ্চার হইল। গ্রামের বহির্ভাগে প্রায় সর্ব্বদাই শ্মশানানল প্রজ্বলিত থাকিত, সকল ঘরেই রোগী, কেহ কাহারও খবর লইতে অবকাশ পায় না, এই দুর্দ্দিনে যোগী রামানন্দ প্রত্যেক ঘরে গিয়া, রোগীগণের শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিলেন। অনশন, রাত্রিজাগরণ এবং গুরুতর পরিশ্রমেও অন্নদাচরণের নৈসর্গিক প্রীতি-প্রফুল্ল মুখমণ্ডলে অবসাদের লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই, তিনি স্বর্গীয় দূতের ন্যায়, বা ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত সর্ব্বত্র সমভাবে ও জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে রোগীর শুশ্রূষা করিয়া বেড়াইতে এবং দলবল সহ নগরকীর্ত্তন করিয়া নৈশভীতি বিদূরিত করিতে লাগিলেন। দুর্দ্দিনের বন্ধু, যোগী রামানন্দ প্রায় পক্ষাধিক কাল যাবৎ অদম্য উৎসাহ সহকারে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করতঃ যেরূপ কঠোর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহা স্মৃতিগোচর হইলেও বিস্ময়ে শরীর রোমাঞ্চিত ও ভক্তি-রসে হৃদয় অভিষিক্ত হইতে থাকে।

কয়েক মাস পরে ৺ অন্নদাচরণ আবার তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন এবং পুত্রমুখ দর্শন পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার সাংসারিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে গুরুকর্তৃক আদিষ্ট হইলেন। কয়েক মাস পরে সন্ন্যাসিবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্নদাচরণ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

বৈরাগ্য-সঞ্চারের পূর্ব্বে অন্নদাচরণের একমাত্র শিশু পুত্রের মৃত্যু হইয়াছিল। কেহ কেহ এই ঘটনাও তাঁহার সংসার বৈরাগ্যের অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সে যাহা হউক, অন্নদাচরণ পুনর্ব্বার পুত্রলাভ পর্য্যন্ত, সাংসারিক ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। এ সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল, জ্বর ও উদরাময়ে নিতান্ত কষ্ট পাইতেছিলেন। সুতরাং বাহ্যিক সাধনাদি প্রায় পরিত্যক্ত

হইয়াছিল। তাঁহার ঈদৃশ ভাবে, নিন্দুক সম্প্রদায়ের মুখ প্রসন্ন হইল, তাঁহারা প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে, অন্নদাচরণের নিন্দাবাদ করিতে লাগিল। তিনি নিন্দুকগণের তাদৃশ বাক্য, বিকারগ্রস্ত রোগী বা বাতুলের প্রলাপের ন্যায় মনে করিতেন। প্রায় এক বৎসর গত হইল, ভগবানের কৃপায়, অন্নদাচরণের একটী পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। অন্নদাচরণের হৃদয় আবার আকুল হইয়া উঠিল, অপত্যস্নেহে তাহার উন্মুক্তহৃদয় আবদ্ধ হইল না, যে বিহঙ্গ পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া একবার আকাশে উত্তীর্ণ হইয়াছে, সে কি কখনও আবার পিঞ্জর প্রবিষ্ট হইয়া থাকে ? পবিত্র মলয় মারুতে যাঁহার হৃদয় সুশীতল হইয়াছে, সে বৃথা তালবৃন্ত সঞ্চালন করিবে কেন ? পূততম মন্দাকিনী সলিলে যাঁহার পিপাসার শান্তি হইয়াছে, কূপজলে কি তাহার পরিতৃপ্তির সম্ভব ? প্রফুল্ল-পঙ্কজানুরক্ত ভ্রমর কি কখনও গন্ধহীন কিংশুকে সন্তুষ্ট হইতে পারে ? সেই নিত্য সত্য বিশুদ্ধ আনন্দলাভের জন্য যে লালায়িত, আপাত মধুর পরিণামে বিষসদৃশ সাংসারিক ভোগসুখে সে আবদ্ধ থাকিবে কেন ? তাই যোগী অন্নদাচরণ আবার সংসার ছাড়িয়া বহির্গত হইলেন, আত্মীয়স্বজনগণ হাহাকার করিতে লাগিল, কিছুতেই তিনি বিরত হইলেন না, কয়েক মাস কাটিয়া গেল। ১২৯৭ সালের আষাঢ় মাসে, আসামের অন্তর্গত ভবানীপুর হইতে পোষ্টকার্ডে সংবাদ আসিল যে, অন্নদাচরণ, ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার আত্মীয়গণ এ সংবাদে আপাতত বিশ্বাস করিলেন না। তথায় বিশ্বস্ত লোক পাঠাইয়া তত্ত্ব জানিলেন, কিন্তু এই সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে কোনও সংশয় রহিল না। কয়েক মাস পরে এইরূপ একটা কিম্বদন্তী শ্রুতিগোচর হইল যে, অন্নদাচরণ মরেন নাই, তিনি কামাখ্যার নিকটবর্ত্তী কোনও পর্ব্বতগুহায় যোগে নিমগ্ন রহিয়াছেন। কতিপয় যাত্রিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু এ সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বিভূতিভূষিতাঙ্গ ত্রিপুণ্ড্রধারী বহুযোগী আমাদের নেত্রগোচর হইয়া থাকে, কিন্তু অন্নদাচরণের মত ভক্তিপ্রবণ, মধুর ভাবাপন্ন, বিশ্বপ্রেমিক সাধু প্রায়ই দর্শন করি নাই। ঈদৃশ মহাপুরুষের স্মৃতি যাহাতে বিলুপ্ত না হইয়া যায়, তাঁহার বংশধর ও আত্মীয় স্বজনের তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য ॥*

শ্রীঅনঙ্গমোহন কাব্যতীর্থ।

* যোগী রামানন্দ স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা লেখক স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং কাশীধামের ক্রিয়া কলাপের কথা রামানন্দ নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। (লেখক)

আত্মরক্ষা।

বোধ হয় সকল জীবেরই, বিশেষতঃ উচ্চশ্রেণীস্থ জীব মাত্রেরই আত্মরক্ষা বৃত্তি আছে। অদ্য এই বৃত্তির বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সম্ভবতঃ উদ্ভিদই এই পৃথিবীর আদিম অধিবাসী। উহারা ধরাতলে বংশবৃদ্ধি করতঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল ; এবং সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছিল। ইতি মধ্যে কোথা

হইতে জন্তু আসিয়া উপস্থিত হইল। জন্তুগণ আসিয়া উহাদিগের মূল, কাণ্ড, ফল, পত্র সকলই আহার করিতে আরম্ভ করিল। প্রাথমিক জন্তুগণ উহাদিগের বিশেষ অনিষ্ট করে নাই। পরে জন্তুগণ যখন বংশপরম্পরায় ধরাতল ছাইয়া ফেলিল, তখন ক্রমেই উদ্ভিদের সর্ব্বনাশ করিতে লাগিল। ক্রমে উহারা উদ্ভিদের সকলই খাইতে আরম্ভ করিল। কেবল তাহাই নহে, কাজে অ-কাজে উহাদিগকে কাটিয়া ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া—নানাবিধ রূপে উৎপীড়িত করিয়া তুলিল। এরূপ অবস্থায় উদ্ভিদের আত্মরক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিত; উহারা আগন্তুক জন্তুগণের অত্যাচারে নির্ব্বংশ হইয়া যাইত, ধরাতলে উহাদিগের নাম মাত্রও থাকিত না। কিন্তু বিধাতার বিস্তীর্ণ জগতে উহাদিগের আবশ্যকতা আছে। তাই উহারা বিনষ্ট হইবে কেন?

উহাদিগের আত্মরক্ষা বৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিল। জন্তুর অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করা আবশ্যক হইল। যেখানেই আত্মরক্ষার চেষ্টা, তাহার মূলে অল্পাধিক অত্যাচার থাকিবেই। অপরে অত্যাচার না করিলে জীবের আত্মরক্ষা করিবার প্রবৃত্তি বিশেষ রূপে জাগ্রত হয় না। তাই সে আত্মশক্তি সম্পূর্ণরূপে বুঝিতেও পায় না; আপনাকে পূর্ণ মাত্রায় চিনিতে পায় না। আর আপনাকে চিনিতে না পারিলে জীবের মুক্তি নাই, বন্ধচ্ছেদ অসম্ভব। "তজ্জলানিতি" * যাহাতে উদ্ভব, আবার তাহাতেই লয়। জীব ব্রহ্মে লীন হইবে। সুতরাং আপনাকে চিনিবেই। আত্মানং বিদ্ধি * এই মহোপদেশ সফল হইবেই। সকল জীবই আপনাকে চিনিবে, বন্ধমুক্ত হইবে; দু দিন অগ্রপশ্চাৎ, এই মাত্র প্রভেদ।

আপনাকে প্রকৃত রূপে চিনিবার প্রধান—বোধ হয় এক মাত্র আত্মরক্ষা বৃত্তি। সকল জীবেরই আত্মরক্ষাবৃত্তির ইহাই মূল।

উদ্ভিদ যখন বুঝিল, সে জন্তুগণ কর্ত্তৃক অশেষ প্রকারে নির্ম্মূল হইতে চলিল, তখন সে কি করিল? আত্মরক্ষার নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল, কেহবা কণ্টকাবৃত হইতে লাগিল, কেহ বা তিক্তরস উৎপাদন করিল, কেহ বিষ প্রস্তুত করিয়া তুলিল। এইরূপে বিবিধ উপায়ে উহারা আত্মরক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। বিবর্ত্তনবাদিগণ জীবকোষের স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন স্বীকার করেন। জীবকোষ, তাঁহাদিগের মতে চিরাতীত কাল হইতে স্বভাবতঃই অল্পাধিক পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে যাহা অবস্থানুসারে উপকারজনক, তাহাই বংশানুক্রমে রক্ষিত হয়; অন্যবিধ পরিবর্ত্তন রক্ষিত হয় না। যে জীব, অবস্থার উপযোগী পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইল, সে বংশবৃদ্ধি করতঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িল; আর যে জীব, ঐরূপ পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইলনা, সে ক্রমে ক্রমে জীবন-ব্যাপারের অনুপযোগী হইয়া পড়িল; অবশেষে মরিয়া নির্ম্মূল হইয়া গেল। সংক্ষেপতঃ ইহাই বিবর্ত্তনবাদ। এই বাদ অনুসারে দেখা যাইতেছে যে, উদ্ভিদদিগের মধ্যে যাহারা জন্তু হইতে আত্মরক্ষার উপযোগীরূপে পরিবর্ত্তিত হইল এবং দেশকালের যোগ্য হইল, তাহারাই জীবিত থাকিয়া বংশ বিস্তার করিতেছে; যাহারা তদ্রূপ হইতে পারে নাই, তাহারা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে সকল উদ্ভিদের দেহ-কোষে তিক্তরস,

* ছান্দোগ্য।

অথবা বিষ, কিম্বা প্রদাহ উৎপাদক পদার্থ সঞ্চিত হইতে লাগিল, তাহাদিগকে জন্তুগণ আর উদরস্থ করিতে পারিল না। জন্তুগণের মধ্যে যাহারা অল্প বয়স্ক,* অনভিজ্ঞ ও বিচার-হীন, তাহারা ঐরূপ উদ্ভিদ আহার করিয়া মরিতে আরম্ভ করিল, অথবা অন্য প্রকারে কষ্ট পাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া অপর জন্তুগণের শিক্ষা হইল। উহারা আর উদ্ভিদকে উৎপীড়িত করিতে সাহসী হইল না। তাই উদ্ভিদ নিরাপদে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইল। মিঠা বিষ, কুচিলা, মান, কচু, ওল, ব্যাঙের ছাতা প্রভৃতি উদ্ভিদ বিষ, অথবা বিষবৎ পদার্থ উৎপন্ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছে। ইহারা অতি নিরীহ ছিল, এখনও মান, কচু, ওল, ব্যাঙের ছাতা দিগের মধ্যে কোন কোন শ্রেণীস্থ উদ্ভিদ নিরীহই আছে। তাহারা বিষ প্রস্তুত করিতে শিক্ষাই করে নাই; সুতরাং জন্তুগণ তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিতেছে। উদ্ভিদের শিশুদিগকেই অধিক উৎপীড়ন করে, তাহাদিগকেই অধিক ভক্ষণ করে। আর তাহারাই আত্মরক্ষার নিমিত্ত বিষ, অথবা বিষবৎ পদার্থ অধিক প্রস্তুতঃ করত নিজের এবং অপরের রক্ষা বিধান করে। উদ্ভিদ শিশু প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে, অর্থাৎ বংশবৃদ্ধি করিবার উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হইলেই এই সকল মারাত্মক পদার্থ সঞ্চয় করতঃ আত্মরক্ষা করিতে উদ্যত হয়। * অধিকাংশ উদ্ভিদই পত্রে, ফলে অথবা অন্য প্রকাশ্য স্থানে এই সকল পদার্থ সঞ্চয় করে; কিন্তু আলু, ওল প্রভৃতি নিরীহ ও উপকারী উদ্ভিদ সকল নিভৃতে মাটীর নীচে বিষবৎ পদার্থ সঞ্চয় করতঃ তদ্দ্বারা বংশবৃদ্ধি সাধন ও আত্মরক্ষা, উভয় কার্য্যই করে।

কিন্তু উদ্ভিদের ও ইতর জন্তুগণের দৈহিক পরিবর্ত্তন দ্বারাই আত্মরক্ষা সিদ্ধ হয়। উচ্চ শ্রেণীস্থ জন্তুগণ দৈহিক ও মানসিক, উভয় বিধ পরিবর্ত্তন দ্বারাই আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। উদ্ভিদের দেহ পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী না হইলে উহারা জীবিত থাকিতেই পারে না, ইতর জন্তুদিগেরও তাহাই। বিছা, বোল্‌তা, মধুমাছি, মাকোড়সা, সর্প প্রভৃতি জন্তুগণ নানাবিধ বিষ অথবা বিষবৎ পদার্থ দেহ মধ্যে উৎপন্ন করে, তদ্দ্বারাই তাহাদিগের আত্মরক্ষা হয়। ইহাদিগের মধ্যে কোন শ্রেণীস্থ জীব, নিরীহ; তাহাদিগকে অপরে মারিয়া ফেলে। কিন্তু কোন কোন শ্রেণী বিষযুক্ত, তাহাদিগকে অপরে সহজে কিছুই করিতে পারে না। এমন যে বিষধর সর্প, তাহারাও সহজে এবং সকলে বিষ সঞ্চয় করে নাই। ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই বিষহীন, কিন্তু তাহারাও বিষযুক্ত সর্পের জ্ঞাতি বিধায় অত্যাচারের হস্ত হইতে প্রায় নিরাপদ হইয়াছে। ইহাদিগের প্রথমে বিষ ছিল না বলিয়াই অনুমান হয়; পরে ইহাদিগের মধ্যে কোন কোন শ্রেণীতে বিষ-পদার্থ জাত হইলে তাহাদিগের আত্মরক্ষার অধিক সম্ভাবনা হইয়াছে। মানবের প্রায় নিকটবর্ত্তী জন্তু বানর; সে বুদ্ধিবৃত্তিতে অপরাপর জন্তু হইতে উন্নত। সুতরাং সে অস্ত্র ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিয়াছে। অন্যের দৈহিক পরিবর্ত্তনই আত্মরক্ষার একমাত্র সম্বল; কিন্তু ইহারা যে পরিমাণে হীন

* These objectionable substances are found most abundant in adult plants, so that they must have reference to flowering and seeding. * * They also indicate that such poisonous defences have been acquired. Cattle often partake of objectionable young plants.—Sagacity and Morality of plants, p 122.

যোগ্য হইয়াছে, সেই পরিমাণেই অস্ত্র ব্যবহারে পটু হইতেছে। ঢিল, লাঠী, বৃক্ষশাখা প্রভৃতি অস্ত্র সাহায্যে ইহারা আত্মরক্ষা করিয়া থাকে।

কিন্তু উদ্ভিদের ও জন্তুর আত্মরক্ষা বৃত্তির মূল কারণ এক নহে। উদ্ভিদ প্রধানতঃ অত্যাচার ও উৎপীড়ন নিবারণ নিমিত্তই আত্মরক্ষার উপযোগী হইয়াছে। কিন্তু জন্তুগণ ক্ষুধার তাড়নায় বিষ অথবা বিষবৎ পদার্থ প্রথমে সঞ্চয় করে, পরে তাহা আত্মরক্ষা কার্য্যে ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিয়াছে। সর্প সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, ইহারা শিকার পাইলে দংশন করতঃ তাহাদিগকে অজ্ঞান ও নিশ্চেষ্ট করিয়া ফেলে, পরে অবসর মত ভক্ষণ করে। অজ্ঞান করিবার উপায় বিষ প্রয়োগ। উহারা আহারের নিমিত্তই চেষ্টিত হয়, পরে আত্মরক্ষার আবশ্যক হইলে তদ্রূপ কার্য্যে বিষ ব্যবহার করে।* উদ্ভিদের আত্মরক্ষার মূল প্রবর্ত্তক কারণ, অত্যাচার, জন্তুগণের ক্ষুন্নিবৃত্তি।

যখন আহারের অনটন উপস্থিত হয়, তখন জন্তুগণ আহারের চেষ্টা করে। আহার দুষ্প্রাপ্য হইলে অথবা অন্য কর্তৃক অপহৃত হইলে উহারা মরিয়া যাইবে। এইরূপ সংকটে আত্মরক্ষার বৃত্তির পরিচালন করিতে বাধ্য হইয়া যথাসাধ্য চেষ্টার জন্তুগণ বুদ্ধিবৃত্তি নিয়োগ করে। উহাদিগের মধ্যে যাহারা অল্পবুদ্ধি, তাহারা স্বভাবজ দৈহিক পরিবর্ত্তনের সাহায্যেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে; আর যাহারা বুদ্ধিবৃত্তিতে উন্নত, তাহারা নানারূপ কৌশলে আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। কেহ প্রকাশ্যে, কেহ বা অপ্রকাশ্যে এইরূপ করিবেই। কার্য্য মাত্রেরই কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়। এক জীব অপর জীবকে বধ করা স্বাভাবিক ক্রিয়া নহে। আক্রমণ আত্মরক্ষার উপায় মাত্র। আত্মরক্ষা-বৃত্তির কারণ কি? অপরের অত্যাচার অথবা ক্ষুন্নিবৃত্তি। আক্রমণের কারণ কি? অত্যাচার অথবা ক্ষুন্নিবৃত্তি। সুতরাং মূলতঃ ইহাদিগকেই কারণ বলিতে হয়।

উদ্ভিদ এবং ইতর জন্তুর পর এক্ষণে মানবের কথা সংক্ষেপে বিবেচনা করা আবশ্যক। জীবতত্ত্বের আলোচনায় ঐ সকলকে এবং মানবকে এক চক্ষুতেই দেখিতে হয়। মানব উক্ত তিন কারণকে একত্রিত করিয়া লইয়াছে। মানবের আত্মরক্ষা বৃত্তির মূলে অত্যাচার ও ক্ষুন্নিবৃত্তি, দুই-ই আছে। যখন অন্য জন্তু অথবা অপর মানব কর্তৃক ইহারা উৎপীড়িত হয়, এবং বিনাশের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার আর কোন উপায় দেখিতে সক্ষম হয় না, তখন মানব বুদ্ধিবলে অস্ত্র উদ্ভাবন করতঃ আত্মরক্ষা করে। মানবের দৈহিক পরিবর্ত্তনে আত্মরক্ষার বিশেষ সুবিধা নাই, তাই, বুদ্ধির আশ্রয় লইতে হয়। মানব প্রধানতঃ অথবা সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিবলেই আত্মরক্ষা করে। তাহাতে অপর জন্তু অথবা অন্য মানবকে সময় সময় আক্রমণ ও বধ করা আবশ্যক হয়। ইহা দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। মানুষে মানুষ বধ করে, দয়াময়ের রাজ্যে ইহা অপেক্ষা নিষ্ঠুর কর্ম্ম আর নাই। কিন্তু মানব এখনও উচ্চ শ্রেণীস্থ জন্তু মাত্র; তাহার উপরে উঠিতে এখনও সক্ষম নাই। সুতরাং এ অবস্থায় এই সকল হৃদয়-বিদারক ঘটনা অত্যাচারের সঙ্গী রূপে বর্ত্ত-

* The primary function of poison apparatus in the economy of snakes is without doubt to serve as the means of procuring their food. But like the weapons of other carnivorous animals, it has assumed the secondary function of an organ of defence. Ency. Brit. vol 22 p 191.

মান থাকিবেই। মানবকে এ নিমিত্ত দোষী করা যায় না। যদি কাহাকেও করা যায়, তবে সে অত্যাচারীকে। অত্যাচারই আক্রমণের মূল; আক্রমণ.আত্মরক্ষার উপায় মাত্র। যেথানে, অত্যাচার নাই, যেখানে ক্ষুন্নিবৃত্তির ইচ্ছা প্রবল নহে, সেথানে আত্মরক্ষা বৃত্তি, বিশেষতঃ আক্রমণ-স্পৃহা, বিশেষ ভাবে জাগ্রত হয় না।

কিন্তু মানব সমাজের নেতৃগণ এ জন্য সর্ব্বদাই অবহেলা করিতেছেন। সে তথ্য জীব মাত্রেই প্রযোজ্য, তাহা মানবসমাজের পক্ষে নেতৃগণ বিস্মৃত হইয়া যান। মানবকে চিনিতে হইলে জীবতত্ত্ব যেরূপ ভাবে অবগত হওয়া উচিত, প্রায় সর্ব্ব সমাজেই নেতৃগণ তাহা জানেন না। তাই পদে পদে ভ্রমে পতিত হইয়া সমাজকে পথভ্রষ্ট করেন। অধ্যাপক রে ল্যাঙ্কেষ্টার মানব সমাজের নেতৃগণের ব্যবহার দৃষ্টে ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি তাহাদিগকে 'মূর্খ, বেউকুফ্, কেরাণির দাস' বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। * তিনি ইংলণ্ডীয় রাজ কর্ম্মচারিগণকেও ঐরূপ আখ্যা হইতে বাদ দিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। যদি ইংলণ্ডের সম্বন্ধেই এই কথা সত্য হয়, তবে অন্যান্য দেশেও হইবে। এতদ্দেশে ত বিশেষরূপেই হইবে, কারণ এখানে ইংলণ্ডীয় উচ্চ শ্রেণীস্থ লোকের রাজকীয় কর্ম্মে প্রায় অসদ্ভাব বলিলেই হয়। সকল দেশেই নেতৃগণ† জানেন না যে, অত্যাচারই আক্রমণের নিমিত্ত-কারণ। এই জ্ঞান থাকিলে আক্রমনকারীদিগকে দয়ার চক্ষে দেখিতেন; তাহা ত দেখেনই না, বরং তাহাদিগকে পদ-দলিত করিবার জন্য সতত চেষ্টা করেন। ইহাই মূর্খতা। বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ টম্‌সন্ বলিতেছেন, Are not criminals mere anachronisms, people out of time or out of place, who require not incarceration or worse, but only transplanting ‡ Transplanting' শব্দে উত্তম সংসর্গ যুক্ত দেশ ও কালকে লক্ষ্য করে। তিনি অন্যত্র ইহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে উপদেশ দিতেছেন। আক্রমণকারিগণকে ক্ষমা করা অসম্ভব হইলে, অন্ততঃ তাহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করা উচিত। ¶ ইহারা কে? ইহারা অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা-প্রয়াসী। যে বৃত্তি সমস্ত জীবমণ্ডলীতে ক্রিয়া করিতেছে, ইহারা স্বভাবতই তৎপ্রাণিত। ইহারা উপায় বিষয়ে কখন কখন ভ্রমে পতিত হয়, সন্দেহ নাই, মনুষ্য মাত্রেই ভ্রমের আধার। কিন্তু ইহারা কৃপার পাত্র। যে অত্যাচার হইতে জীব আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত আক্রমণ অবলম্বন করে, তাহাই সংযত করা বিজ্ঞানানুমোদিত। কিন্তু যত দিন অধ্যাপক ল্যাঙ্কেষ্টারের উক্তি সত্য থাকিবে, ততদিন নেতৃগণ তাহা বুঝিবেন না।

যোগ্যতমের জয়—এই বিধি আত্মরক্ষার জনক। আত্মরক্ষা বৃত্তিই জীবকে উত্তরোত্তর উন্নত করিয়াছে; নচেৎ জীব এতদিন

* A body of clerks without any pretence to an education in the knowledge of nature, headed by gentlemen of title equally ignorant Kingdom of Man p 48.

† যাঁহারা রাজ্য পরিপালন করেন, তাঁহাদিগকেই এই শব্দে অভিহিত করিতেছি।

‡ Heredity p 531.

¶ যাহাকে Reactionary কিম্বা "of the restless type" বলা হয়, if he cannot be pardoned when we know all, can at least be better dealt with the better he is understood. Ibid p 524.

ধরাতলে থাকিতেই পারিত না। এই বৃত্তি বিবিধ সদ্‌গুণের আধার। ইহা হইতেই সমাজ ও সামাজিক ধর্ম্ম উদ্ভব হইয়াছে। পরস্পরের রক্ষার নিমিত্তেই জীব সমাজবদ্ধ হয়, এবং তাহা হইতেই সমাজ ধর্ম্মের আবির্ভাব। এই সামাজিক বৃত্তি যিনি দলিত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি জীবের শত্রু। এই বৃত্তিই জীবকে উত্তরোত্তর দেব ভাবে পূর্ণ করিবে, ইহাই জীবের মুক্তির কারণ, বন্ধচ্ছেদের উপায়। নেতৃগণ যত শীঘ্র এই তথ্য হৃদয়ঙ্গম করেন, ততই জগতের মঙ্গল, ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

শ্রীশশধর রায়।

মহর্ষি সুদাসের যুদ্ধ-যাত্রা।

[ঋগ্বেদ—৭।১৩৩।১ ৭]*

সুদাস—

যাহার সুচারু পুণ্য প্রতাপ বসুধাবক্ষে [illegible]মান,
যাঁহার অমোঘ শক্তি প্রভাবে [illegible] বিচ্যুমান,
যাঁহার প্রসাদে উপার্জ্জ সমরে দৃপ্ত অদম্য অমর [illegible],—
স্বয়ং ইন্দ্র সেই পার্শ্বে,—চল, মিলি [illegible] দল।
বাহুতে শক্তি, হৃদয়ে ভক্তি, [illegible] পূর্ণ তূণ—

সৈন্যগণ—

ছিন্ন হউক কুশ্রী অরির ঘৃণ্য তুচ্ছ ধনুর্গুণ। (১)

সুদাস—

দেবতা ইন্দ্র [illegible] বক্ষ বক্ষে [illegible], [illegible]
বহায়েছ নদী [illegible]নির্ঝা, উর্ব্বর [illegible],
ধরণীর যত [illegible] তোমারি কৃ[illegible]
ঋদ্ধির মম তুমিই জনক সাধা কা[illegible] হৃদয়ে কায়?
তোমারি চরণ বক্ষে ধরিয়ে চলিছ সমরে অন্ধ মন,—

সৈন্যগণ—

কুৎসিত ধনু-সমেত ছিন্ন হউক্ ঘৃণ্য শত্রুগণ। (২)

সুদাস—

দেবতা ইন্দ্র! তোমারি ইচ্ছা হউক্ মোদের ধ্রুব নিশান,
করুক্ মোদের চিত্ত তোমারে অবিরত-ধ্যানে ভক্তিমান,
উম্মিত কর মোদের শীর্ষে বর্দ্ধক তব উদার কর,
অগ্নিদীপ্ত হস্ত তোমার হানুক্ মৃত্যু অরাতি'পর,—
হানুক্ মৃত্যু শত্রুর মাথে, আমাদিগে যারা বধিতে চায়,

সৈন্যগণ—

ছিন্ন হউক্ ঘৃণ্য অরির কুৎসিত ধনু, কুশ্রী কায়। (৩)

সুদাস—

দেবতা ইন্দ্র! তুমি [illegible] সদৃশ দস্যুগণ,
[illegible] বধে [illegible] মন,
[illegible] চরণে [illegible],
[illegible] তোমার শাসন [illegible] শত্রুরা?
অদ্ভুত তব শক্তির কাছে পরাভূত [illegible],—

সৈন্যগণ—

ছিন্ন হউক্ ঘৃণ্য অরির কুৎসিত [illegible] (৪)

সুদাস—

দেবতা ইন্দ্র! সমানভাগী কি বা নিকৃষ্ট শত্রু আর,—
তোমরা বিশাল [illegible],
[illegible] নাশে [illegible]।
আমরা কি তুমি সমর [illegible]
তোমারি জয়।
তোমারি শক্তি [illegible] তোমারি প্রেরণা
হৃদয়ে বল,—

সৈন্যগণ—

কুৎসিত ধনু-সমেত ছিন্ন হোক্ নাশ শত্রুদল। (৫)

সুদাস—

দেবতা ইন্দ্র! সর্ব্বভাবে আমরা তোমারি,
তুমিই সার,
সুখে বা বিপদে চরম বন্ধু, পরম দাতা উপাসনার।
বিদূরিত কর সকল দুরিত, প্রার্থনা এই, এ মনোরথ,
যেন প্রাণান্তে কখন না ছাড়ি তব নিগমের নিত্য পথ,
বিজয়-গর্ব্ব কখন না যেন ধর্ম্মের বাহিরে টলায় মন,

সৈন্যগণ—

হউক্ স-ধনু নিধন-প্রাপ্ত দুর্ম্মতি যত শত্রুগণ। (৬)

* অবিকল অনুবাদ নহে; যাহা সৈন্যগণের উক্তি করা হইয়াছে, তাহা মূলে সুদাসেরই উক্তি ছিল। শব্দার্থ প্রায়শঃ রক্ষিত হইলেও, ভাবার্থ লইয়া কবিতা-রচনারই প্রয়াসী হইয়াছি। সায়ণাচার্য্যের টীকার সহিত মিলাইয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই। যদি কেহ দেখেন, কোন কোন স্থানে পার্থক্যের জন্য প্রস্তুত থাকিবেন। ভাবার্থের জন্য ৺ উমেশচন্দ্র বটব্যালের অনুবাদের সাহায্য লইয়াছি। ব, চ, মি।

সুদাস—

দেবতা ইন্দ্র ! জয়লাভ সনে উপাসনা-কারী চায় এ বর,
দাও সে বিদ্যা ঋদ্ধি-সাধন যাহে লভে ধন শ্রেষ্ঠতর,—
আমার পালনে ধরিত্রী-ধেনু বিশাল-আপীন-শালিনী হোক্,
সহস্র-ধারে দুগ্ধ-ক্ষরণ প্রজা অজস্র করুক্ ভোগ।
অপাপবিদ্ধ রাজ্য আমার হউক্ মর্ত্তে অমর-ধাম,—

সৈন্যগণ—

পূর্ণ হউক্ সুদাসরাজার কল্যাণময় মনস্কাম। (৭)

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

নব সমাগম। (২)

এই সকল কথা বলা যত সহজ, কার্য্যে পরিণত করা তেমন নহে। বুঝিলাম, নব সমাগমের ফল অতীব শোচনীয়, কিন্তু চীনের ন্যায় সমস্ত দেশ প্রাচীর-বেষ্টিত করিয়া রাখিলেও ত দূরবর্ত্তী বিভিন্ন জাতীয় মানবগণের আগমন প্রতিরোধ করিবার উপায় নাই। বর্ত্তমান যুগে মানবগণ দেশ দেশান্তরে গতায়াত করিবেই, ইহা নিবৃত্ত হইবার নহে। শিক্ষা, বাণিজ্য অথবা রাজ্যলোভ ইত্যাদি মানবকে ধরাতলের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে লইয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা কাহারও নিবারণ করিবার সাধ্য নাই। দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, আফগানস্থান, তিব্বত, নেপাল প্রভৃতি দেশবাসিগণ অপর জাতীয় মানবকে স্ব স্ব দেশ মধ্যে প্রবেশাধিকার দিতেছেন না, সত্য। কিন্তু তাঁহারা দীর্ঘকাল ঐরূপ করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া বোধ হয় না। যদি প্রকৃতই তাঁহারা সক্ষম হন, তাহা হইলেও বহু আয়াস ব্যতীত কৃতকার্য্য হইবেন না। তাঁহারা স্বাধীন, তাঁহাদিগেরই যদি এত আয়াস আবশ্যক হয়, তবে পরাধীন জাতিগণের সম্বন্ধে কি বলা যাইতে পারে? ইহারা নব সমাগম রোধ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। যতদিন ইহারা অপরের অধীন থাকিবে, ততদিন তাহাদিগের গতায়াত নিবারণ করিতে কখনই পারিবে না; সুতরাং নব সমাগমের বিষময় ফল হইতে সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষা করিবার কোনই উপায় ইহাদিগের নাই। তথাপি একরূপ স্থলেও আত্মরক্ষা একবারে অসম্ভব নহে। আমরা দেখিয়াছি, নব সমাগম-জনিত শোচনীয় পরিণামের মূল কারণ কি? মূল কারণ পীড়া ও জনন-হীনতা। ইহারা কিরূপে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা এখনও বুঝা যায় নাই। কিন্তু ইহারা উপস্থিত হইলেই বুঝিতে হইবে যে, আক্রান্ত জাতির পরমায়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং বাঁচিতে চাহিলে ইহাদিগকে রোধ করিতে হইবে। পীড়া ও জনন-হীনতার কারণ সম্যক্‌রূপে আলোচিত হয় নাই, বিজ্ঞান এখনও এই বিষয় যথোচিত ভাবে অনুশীলন করিতে সমর্থ নহে। তথাপি ইহা একরূপ বুঝা যাইতে পারে যে, সংমিশ্রণই কোনরূপে ঐ কারণদ্বয়কে আনয়ন করে। বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ হইতে পীড়ার উদ্ভব হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু ইহা হইতে কিরূপে জনন-হীনতা উৎপন্ন হয়, তাহা এখনও বুঝা যায় নাই। ডারুইন স্বয়ং ইহাকে mysterious অর্থাৎ অবোধগম্য বলিয়াছেন। যাহা হউক্, সংমিশ্রণকেই

ইহাদিগের কারণ বলিয়া অঙ্গীকার করা যায়। বিজ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন।

যদি তাহাই হইল, যদি বিভিন্ন জাতীয় মানবের সংমিশ্রণই পীড়া ও জনন-হীনতার কারণ বলিয়া বিবেচিত হইল, যদি উহারাই জাতীয় বিলোপের অন্যতর কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তবে বিলোপের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপায় চিন্তা করা কঠিন নহে। সংমিশ্রণ ত্যাগ কর, তাহা হইলেই কারণের অভাব হইল, সুতরাং কার্য্যোৎপত্তিও অসম্ভব। অপর জাতীয়ের সহিত সংমিশ্রণ ত্যাগ করিলেই পীড়া ও জনন-হীনতা নিবৃত্ত হইল, সুতরাং জাতীয় বিলোপও সিদ্ধ হইল না। নব সমাগম যে উপায়ে ধ্বংসক্রিয়া সাধন করে, সেই উপায় রহিত হইলেই ক্রিয়াও রহিত হইবে। কিন্তু বিভিন্ন জাতীয়গণের সমাগম হইবে, অথচ সংশ্রব কিম্বা সংমিশ্রণ হইবে না,—ইহা কি সম্ভব? আমি বলি, সম্পূর্ণ সম্ভব না হইলেও ইচ্ছা থাকিলে একবারে অসম্ভব নহে।

নবাগতগণের সহিত সংশ্রব প্রধানতঃ কি কি কারণে হইয়া থাকে? বাণিজ্য, দাস্য ও শিক্ষা। যদি নবাগতগণ রাজপদ লাভ করে, তাহা হইলে তদুপলক্ষেও আদিমবাসীদিগের সহিত সংশ্রব হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত হেতু, অর্থাৎ বাণিজ্য, দাস্য ও শিক্ষা, সহজেই প্রতিরোধ করা যায়। ঐ সকল হেতুমূলক সংশ্রব ত্যাগ করা কঠিন নহে। উহা জাতীয় ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভর করে। জাতীয় ইচ্ছা হিতাহিত বিবেচনা দ্বারা নিয়মিত হয়। সুতরাং যথোপযুক্ত শিক্ষা দ্বারা হিতাহিত-বোধ জাত হইলেই এই শ্রেণীর সংশ্রব ত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইতে পারে। নব সমাগমের কু-ফল সকল হৃদয়ঙ্গম হইলে এ সংশ্রব ত্যাগ করা কঠিন হয় না। ইহা নবাগতগণের প্রতি বিদ্বেষমূলক ভাব নহে। ইহা কেবল উক্ত কুফল হইতে আত্মরক্ষা মাত্র। কিন্তু যে সংশ্রব রাজা-প্রজা সম্বন্ধ মূলক, তাহা ত্যাগ করা সহজ নহে; সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা অসম্ভব; অর্থাৎ যতদিন ঐ সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ততদিন অসম্ভব। তথাপি ঐ সম্বন্ধের অপলাপ না করিয়াও এ পক্ষে আংশিক চেষ্টা করা যাইতে পারে। তাহাতে রাজবিধি লঙ্ঘন করা আবশ্যক হয় না। সকল মানব সমাজের পক্ষেই এ কথা প্রযোজ্য; বিশেষতঃ যেরূপ সমাজে রাজা কেবল দেশরক্ষক মাত্র, তদ্রূপ সমাজে এ কথা বিশেষ ভাবে সত্য। এস্থলে আর্য্যজাতির কথা স্মরণ করা যাইতে পারে। আর্য্যগণের রাজা বিধি প্রণয়নে অক্ষম। জন সাধারণের মধ্যে যাঁহারা বিদ্যাবান ও বুদ্ধিমান, তাঁহারাই বিধিপ্রণেতা। রাজা প্রজা উভয়েই তাহা নতশিরে পালন করিতে বাধ্য। জাতীয় শিক্ষা ও বিদ্বৎমণ্ডলীর হস্তে, রাজার সহিত তাহার কোন সংশ্রব নাই। দেশের স্বাস্থ্যরক্ষার ন্যায় গুরুতর কার্য্য ও আর্য্য জনসমাজের স্বায়ত্ত, রাজাকে তন্নিমিত্ত কোন প্রয়াস স্বীকার করিতে হয় না। দেশীয় সমাজে পরস্পরের মধ্যে শান্তিরক্ষার কার্য্যও দেশবাসিগণের; রাজকীয় সৈন্যগণের উপর সে ভার ন্যস্ত নহে। অর্থী প্রত্যর্থীদিগের বাদ প্রতিবাদের মীমাংসা করা যদিও বিধি অনুসারে রাজার কর্ত্তব্য, তথাপি ঐ কার্য্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী দেশীয় প্রধানবর্গের হস্তেই ন্যস্ত। কারণ অসংখ্য বাদ-প্রতিবাদ মীমাংসা করা রাজার

সাধ্যাতীত। সর্ব্বকালেই ইহার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। সকলকালেই রাজকর্ম্মচারীগণ যে সংখ্যক বাদ প্রতিবাদ মীমাংসা করিয়া থাকেন, দেশীয় জনসাধারণ তাহার শত গুণ অধিক মীমাংসা করিয়া থাকেন। সুতরাং বিধি প্রণয়ন, শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থ্য ও শান্তিরক্ষা, মীমাংসা প্রভৃতি সকল কার্য্যই জনসাধারণের আয়ত্ত, রাজার তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষমতা নাই। ইহাই আর্য্য সমাজের রাজা-প্রজা সম্বন্ধের বিশেষত্ব। অপর সমাজের আদর্শ ভিন্ন রূপ। তাহাদিগের মধ্যে রাজাই সব, জনসাধারণের প্রায় কিছুই নহে। রাজ সম্মতি অথবা রাজাজ্ঞা না হইলে উল্লিখিত কোন কার্য্যই ঐ সকল সমাজে সিদ্ধ হয় না। কিন্তু আর্য্য সমাজে উহা প্রায় রাজার নিরপেক্ষ ভাবেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাই যদি আর্য্য সমাজের আদর্শ হইল, তবে কর গ্রহণ ও দেশ রক্ষা, অর্থাৎ বিভিন্ন সমাজস্থ জনগণের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করা,—এই উভয় কার্য্যই রাজার প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। অপরাপর কার্য্যের সহিত রাজার বিশেষ কোন সম্বন্ধ থাকিতেছে না। এই সনাতন আদর্শ অঙ্গীকার করিলে, রাজা প্রজা সম্বন্ধে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও অপরাপর বিষয়ে রাজ-সংশ্রব ত্যাগ করা অসম্ভব নহে। কেবল মাত্র কর প্রদান ও দেশ রক্ষার সহায়তা করিলেই প্রজাভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়া গেল। তদ্ভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্ত কার্য্যই রাজার নিরপেক্ষ ভাবে অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে; এবং তদ্রূপ করাই সঙ্গত। নতুবা জনসাধারণ ক্রমে রাজপ্রত্যাশী হইতে হইতে স্বাবলম্বন শূন্য হইয়া অধঃপাতে যাইবার বিশেষ আশঙ্কা উপস্থিত হয়। এই হেতু নবাগতগণ রাজপদ প্রাপ্ত হইলেও আদিমবাসিগণ উল্লিখিত দ্বিবিধ প্রজার ধর্ম্ম পালন করিলেই যথেষ্ট হয়, অন্যান্য বিষয়ে তাহাদিগের সংস্রব ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ কল্প। নবসমাগমের পেষণার ফল হইতে আত্মরক্ষা করিবার একমাত্র উপায়ই, সংশ্রব-ত্যাগ। সুতরাং যতদূর সম্ভব, নবাগতগণের সংশ্রব ত্যাগ করাই প্রশস্ত। ইহা রাজা প্রজা সম্বন্ধের বিরোধী নহে, ইহা বিদ্বেষমূলকও নহে; কর দান ও দেশ রক্ষার সহায়তা করিলেই প্রজাধর্ম্ম স্থির থাকিল, অন্য বিষয়ে সংশ্রব ত্যাগ করা কেবল জাতীয় বিলোপ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা মাত্র। সেই সকল বিষয় স্বায়ত্ত থাকিলেই যে রাজসংশ্রব ত্যাগ করা হইল, তাহা নহে, অপরের নিয়োগ মত অর্থাৎ জনসাধারণ ব্যতীত অন্যের বিধানানুসারে ঐ সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলেই সংশ্রব রহিয়া গেল। তাহা হইলেই আত্মরক্ষা হইল না। সুতরাং অন্যান্য কার্য্য জনসাধারণের সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে জনসাধারণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক, অথবা ঐ ভাবেই তাহাদিগের মধ্য হইতে নির্দ্দিষ্ট জনগণ কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হওয়া কর্ত্তব্য।

এইরূপে রাজস্ব মাত্র, (বৈতনিক হউক অথবা অবৈতনিক হউক) শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শান্তিরক্ষা, মীমাংসা বিধি প্রণয়ন ইত্যাদি সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্য্যে নবাগতগণের সংশ্রব পরিত্যাগ করাই আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়। নচেৎ পীড়া ও জননহীনত্ব হইতে, নিরুদ্যম ও অবসাদের গ্রাস হইতে, অবশেষে জাতীয় বিলোপের যমদণ্ড হইতে, আত্মরক্ষা করা অতীব অসম্ভব। নানা দেশীয়, নানা জাতীয় মানব সমাজ এই বৈজ্ঞানিক তথ্য যত শীঘ্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, ততই মঙ্গল। ইহাকে যে নাম দিতে হয় দাও; কিন্তু ইহা মানবের মঙ্গল বিধান, মানবের অনিষ্ট সাধন নহে।

শ্রীশশধর রায়।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ও চণ্ডীকাব্য। (১)

এই প্রাচীন কবি ও তাহার কাব্য লইয়া দেশী ও বিদেশী অনেকেই নাড়াচাড়া করিয়াছেন। তবে আবার স্বর্গীয় কবির আত্মাকে জ্বালাতন করিবার এ নূতন প্রয়াস কেন? উত্তর—বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ ইত্যাদি দ্বারাই আমাদের জাতীয় সাহিত্য গঠিত হইয়াছে—ইঁহাদের কাব্য প্রত্যেক বঙ্গসন্তানের সম্পত্তি, প্রত্যেকেরই তাহা লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিবার অধিকার আছে। কবিকঙ্কণের কাব্য ও তাহা হইতে তাৎকালিক বঙ্গসমাজের অবস্থা আলোচনা করিতে গিয়া যদি পাঠককে কোন নূতন কথা বুঝাইতে পারি, কিম্বা তাঁহার মনে কোন নূতন কৌতূহল জন্মাইতে পারি, ভালই। না পারিলেও বিশেষ অপরাধ হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই কৈফিয়তে হয়ত অনেকে সন্তুষ্ট হইবেন না। না হইলে লেখক নাচার।

প্রাচীন অনেক বঙ্গকবিই স্বকৃত গ্রন্থে নিজের কিছু না কিছু পরিচয় দিয়া পরবর্ত্তী প্রত্নতত্ত্ববিৎগণের পরিশ্রমের লাঘব করিয়া গিয়াছেন। কবিকঙ্কণের কাব্যেও তাঁহার আত্ম-পরিচয় আছে। বটতলার অনুগ্রহে কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয় অনেক দিন লুক্কায়িত ছিল। ফুলিয়ার এই কুলীন ব্রাহ্মণের জাতি লইয়া এক সময়ে বিষম সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি "মুরারি ওঝার নাতি" এইটুকু মাত্র জানিয়া কেহ কেহ হয়ত মালবৈদ্যদিগের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টায় ছিলেন। এখন বঙ্গের কৃতী সন্তানগণের চেষ্টায় তাঁহার আত্মবিবরণ অন্ধকারের গহ্বর হইতে বাহির হইয়াছে। এখন ঘটকঠাকুরগণের সাহায্যে আমরা সৃষ্টিকারক ব্রহ্মা হইতে তাঁহার বংশাবলীর তালিকা প্রস্তুত করিতে সমর্থ। কবিকঙ্কণকে কখন এতদ্রূপ দুর্ভাগ্যে পড়িতে হয় নাই। কিন্তু তিনি যে এই জাতীয় দুর্ভাগ্য একেবারে অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন, তাহাও নহে। প্রচলিত ছাপার চণ্ডীকাব্যে (আমরা প্রচলিত নিয়মানুসারে তাঁহার কাব্যকে "চণ্ডীকাব্য" বলিলাম) তিনি "কুয়াড়ী কুলেতে খ্যাতি মহামিশ্র* জগন্নাথ" এর পৌত্র এবং হৃদয় মিশ্রের পুত্র, এই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু কবির হস্তলিখিত বলিয়া পরিচিত যে পুঁথি অল্প দিন হইল তাঁহার জন্মভূমি দামুন্যা গ্রাম হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চেষ্টায় সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে "কয়ড়ি কুলের বাঘা মুরারি। তপন ওঝা তস্য সুত উমাপতি নাম' ইত্যাদি আরও পূর্ব্ব পুরুষগণের উল্লেখ আছে। মুকুন্দরামের বংশধরগণ এখনও বর্ত্তমান। সুতরাং তপন ওঝা হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত তাঁহার একটী বংশ বিবরণ সহজেই সংগৃহীত হইয়াছে। কুয়ারী গাঁইএর আদি পুরুষ বাচস্পতি মিশ্রের উল্লিখিত জন হইতে তপন ওঝা পর্য্যন্ত একটী বংশ তালিকা সংগ্রহ তত টা সহজ নহে, কারণ মুকুন্দরাম কুলীন ছিলেন না। বঙ্গের ঘটকগণ কেবল কুলীনদিগেরই ধারাবাহিক বংশ

বিবরণ লিখিতেন। মুকুন্দরামের কুয়ারী বা কয়ড়া কুল শ্রোত্রিয়বংশীয় এবং কাশ্যপ গোত্রীয়। ইহা বিশুদ্ধ শ্রোত্রিয় কিনা, তাহারও এপর্য্যন্ত স্থির মীমাংসা হয় নাই। কাহারও কাহারও মতে সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগের মধ্য হইতে এই গাঁইএর উৎপত্তি এবং কালক্রমে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের শ্রোত্রিয় শ্রেণীতে প্রবেশ।

মুকুন্দরাম কান্যকুব্জাগত দক্ষের সন্ততি হউন অথবা প্রাচীন বঙ্গদেশীয় সপ্তশতী ব্রাহ্মণ বংশীয়ই হউন, তাঁহার গ্রন্থ বা কীর্ত্তির তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। ব্রাহ্মণ সমাজে তাঁহার আসন যে স্থানেই হউক, তাঁহার পৌরুষ চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। চণ্ডীকাব্য হইতে জানা যায়, মুকুন্দরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম বা উপাধি কবিচন্দ্র, পুত্রের নাম শিবরাম, কন্যার নাম যশোদা, পুত্রবধূর নাম চিত্রলেখা এবং জামাতার নাম মহেশ। এই সকল নাম হইতেই বুঝিতে পারা যায়, চণ্ডীকাব্যে কবির যৌবনের উদ্দাম লেখনী-প্রসূত নহে। পূর্ব্বে শ্রোত্রিয় ও বংশজের বিবাহ সাধারণতঃ বিলম্বে ঘটিত। এ অবস্থায় বিবাহিত পুত্রকন্যার পিতা মুকুন্দরাম যে পরিণত বয়সে তাঁহার এই কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। কাব্যের এক স্থানেও কবি পরিহাসচ্ছলে লিখিয়াছেন "বুড়াকে না করে গুণ মোহন ঔষধ"।

কবিকঙ্কণের জন্মভূমি দামুন্যা গ্রাম বর্দ্ধমান জেলার সেলিমাবাদ পরগণার অন্তর্গত। এখানে তাঁহার "নিবাস পুরুষ ছয় সাত"। দামুন্যা হইতে কয়ড়া গ্রাম অধিক দূরবর্ত্তী নহে; সুতরাং ছয় সাত পুরুষের পূর্ব্বেও যে এই বংশীয়েরা নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে বাস করিতেন, এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ উপাধি কোথা হইতে আসিল, তাহা জানা যায় না, তবে তাঁহার কাব্য হইতে জানা যায় যে, কবিত্বশক্তি তাঁহার পিতামহের আমল হইতে পারিবারিক সম্পত্তি রূপে গণ্য ছিল।

কবি রাজপুরুষের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুর্ভাগ্যের নানা ভ্রূকুটি সহ্য করিয়া বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটাল থানার অধীন আড়রা গ্রামে গুণগ্রাহী ব্রাহ্মণ জমীদার বাকুড়া রায় ও তাঁহার পুত্র রঘুনাথ রায়ের আশ্রয়ে থাকিয়া কাব্য প্রণয়ন করেন। এই পলায়নের যে করুণরসাত্মক বিবরণ কবি স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই মর্ম্মস্পর্শী। দুর্বৃত্ত ডিহিদার মামুদ সরিফ কবির অনুগ্রহে বা নিগ্রহে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত চণ্ডীকাব্যে দেখিতে পাই "ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজভৃঙ্গ, গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ, সে মানসিংহের কালে, প্রজার পাপের ফলে, ডিহিদার মামুদ সরিফ" ইত্যাদি। দামুন্যায় আবিষ্কৃত হস্তলিখিত পুঁথিতে নাকি "ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজ-ভৃঙ্গ, গৌড়-বঙ্গ উৎকল-অধিপ, অধর্ম্মী রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে, খিলাৎ পায় মামুদ সরিফ" এইরূপ পাঠ আছে। এই পাঠই সুসঙ্গত মনে হয়। এই পলায়নের সময়েই পথে কবি গীত রচনার জন্য চণ্ডীর আদেশ প্রাপ্ত হন বলিয়া লিখিয়াছেন।

"শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥"

অর্থাৎ ১৪৯৯ শকে বা ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কবি কাব্য রচনার আদেশ প্রাপ্ত হন।

মানসিংহ ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হইয়া আসেন। সুতরাং গ্রন্থ প্রণয়নের সময় সম্বন্ধে উদ্ধৃত শ্লোকের কোন মূল্য থাকিলে কবিবর্ণিত মামুদসরিফের অত্যাচার কখন রাজা মানসিংহের সময়ে হইতে পারে না। ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন কুলি খাঁ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা। কবি পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তা হোসেন কুলি খাঁর সময়ের সহিত পরবর্ত্তী শাসনকালের তুলনা করিয়াছেন, এই মতই যুক্তিযুক্ত।

চণ্ডীকাব্য যে যুগে রচিত হইয়াছে, তাহা ভারতে মুসলমান রাজত্বের উজ্জ্বল যুগ। বিলাতে তাহা স্পেনিয় আরমাদার পরাভব, ইংলণ্ডের নৌবলের প্রভাববৃদ্ধি এবং সেক্ষপিয়র ও বেন্‌জনসনের অমৃতবর্ষিণী কবিতার যুগ। তখন প্রতীচ্য ভারতে মহামান্য প্রতাপসিংহ স্বাধীনভাবের উদ্দীপনায় দুর্জ্জয় মোগলবাহিনীর প্রতিকূলে বদ্ধপরিকর। বঙ্গদেশে তখন মামুদ সরিফের ন্যায় রাজকর্ম্মচারীর ব্যবহারে উত্ত্যক্ত হইয়া প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি প্রধান প্রধান কয়েক জন সামন্ত দিল্লীশ্বরের প্রতাপকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিতে প্রস্তুত। নিরীহ বঙ্গকবি এই সময়ে নৃমুণ্ডমালিনী শক্তির মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে গিয়া কতদূর সফলকাম হইয়াছেন, আমরা ৩০০ বৎসরের অধিককাল পরে বৈদেশিক-শাসনলব্ধ শান্তির ছায়ায় বসিয়া, সমুদ্রের অপরপারবর্ত্তী গুরুগণের নিকট প্রাপ্ত সমালোচনার মানদণ্ড দ্বারা একবার তাহার পরিমাণ করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। পাঠককে একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া কাব্যবর্ণিত চরিত্রগুলির অনুসরণ করিতে হইবে। কবির নিন্দা বা স্তুতি এ প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে—তাঁহাকে বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

আমাদের কবি বঙ্গদেশের পূর্ব্ব-প্রচলিত প্রথানুসারে গণেশাদি অনেক দেবতার বন্দনা করিয়া কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি চণ্ডী কাব্য লিখিতেছেন বলিয়া বৈষ্ণববিদ্বেষী নহেন। গ্রন্থের প্রথম ভাগেই চৈতন্যদেবকে হরির অবতার স্বীকার করিয়া তাঁহার বন্দনা করিয়াছেন। বাস্তবিক মীনমাংসত্যাগী হরিপদসেবী জগন্নাথের পৌত্র মুকুন্দরাম হরিকে তাঁহার কাব্যের দেবতা চণ্ডী অপেক্ষা নিম্নতর আসন দিয়াছেন বলিয়া বিবেচনা হয় না। একস্থানে দেখিতে পাই, শ্রীমন্ত দেবীকে স্তব করিবার সময়ে বলিতেছেন—

"হরিহর বিধি হইয়া অবধি
হৈমবতী সবে সেবে"।

অন্যত্র শ্রীমন্ত তাঁহার পিতাকে বলিতেছেন—

"আদ্যাশক্তি নারায়ণী ইন্দ্র আদি পূজে
ব্রহ্মা হরিহর শুক চরণের বজে।"

অন্যত্র আবার কবি দেবীকে দিয়া নারায়ণকে প্রভু বলাইয়া লইয়া ছাড়িয়াছেন—

"সলিলে ডুবিলে মহী, আশ্রয় করিল অহি,
শয়ন করিলা নারায়ণ,
সেই অবসান কালে প্রভুর শ্রবণ মলে,
দুই দৈত্যে কৈল মহারণ।"

কবি মালাধরের জন্মের বন্দোবস্ত করিবার সময়ে লিখিয়াছেন—

"গৌরী সঙ্গে ত্রিপুরারি, গঙ্গায় ভাসায়ে তরী,
কৃষ্ণকথায় কুতূহল মন।"

ইহার কিছু পরে মহাদেব মালাধরকে বলিতেছেন—

"আমি অবধূত জন, হরিভক্তি মোর ধন,
স্বর্ণ রৌপ্য নাহি আভরণ।"

ধনপতির নৌকা পবননন্দনের সাহায্যে

সাগরায় ডুবাইয়া অনুতপ্ত ও শঙ্কিত দেবী বলিতেছেন—

"যেই সেবে হরিহর তারে মোর লাগে ডর,
ব্রহ্মবধ সম তার বধ।"

ফুল্লরার গৃহে বিশ্বকর্ম্মা দেবীর

"কাঁচুলীর মধ্য ভাগে লেখে বৃন্দাবন"॥

গ্রন্থের শেষ ভাগে ভগবতী স্বয়ং খুল্লনাকে উপদেশ দিতেছেন—

"কলিকাল গরলে ঔষধ নারায়ণ।
বদনে বলিলে পান না দেখে শমন॥"

এই সমস্ত আলোচনা করিলে মুকুন্দরাম স্বয়ং শাক্ত কি বৈষ্ণব ছিলেন, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন হয়। কিন্তু গ্রন্থের নানা অংশে মনোযোগ দিলেই প্রতীতি জন্মে যে, যদিও তিনি কাব্যে অনেক দেবতা অপেক্ষা চণ্ডী দেবীর মাহাত্ম্য বা শক্তির আধিক্য বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তথাপি কবি প্রকৃতপক্ষে তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজক। জল, স্থল, অন্তরীক্ষে যেখানে কোন দেবতার মূর্ত্তি বা অবস্থিতি তাঁহার চর্ম্মচক্ষু বা মানস চক্ষুর বিষয়ীভূত, সেইখানেই তিনি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে প্রস্তুত। গ্রন্থের প্রথম ভাগে তিনি কেবল কয়েকটী দেবতার মামুলি বন্দনা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। দিগ্বন্দনার মধ্যে নিরাকার ধর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া দামুন্যা এবং তন্নিকটবর্ত্তী বিবিধ গ্রামের বিবিধ স্থাপিত দেবতার বন্দনা গাইয়াছেন। ইলিপুরের রঙ্কিণী, চণ্ডীপুরের বারাহী, পাড়াম্বুরার কামারবুড়ী প্রভৃতি বহু দেবতাই তাঁহার ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছেন। জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিদ্বের পথ প্রদর্শকগণ ভক্তির সহিত বন্দিত হইয়াছেন। গীতপথের পরিচয়দাতা, মাণিকদত্ত বিনয় পাইয়াছেন।—তিনি ব্রাহ্মণ নহেন, সুতরাং ব্রাহ্মণ কবির বন্দনা পাইতে পারেন না। শেষ কালে কবি বলিয়া ফেলিয়াছেন,

"ডাকিনী যোগিনী বন্দোঁ শ্রীধর্ম্মের পা।
লবধ হইয়া যে মোর আসরে করে ঘা॥
তিনি মোর ভগিনী আমি তার ভাই।
আসরেতে করে ঘা চণ্ডীর দোহাই॥"

এই আঁটাআঁটি বাঁধাবাঁধির "চণ্ডীর দোহাই" এর মধ্যে যেমন এক দিকে কবির ভক্তিপ্রবণ হৃদয়ের পরিচয় পাই, অপর দিকে তেমনি দেবচরিত্রের সঙ্কীর্ণতা জাজ্জ্বল্যমান ভাবে ফুটিয়া উঠে।

চণ্ডীকাব্য আড়রাপতির সভায় গীত হইবার জন্য রচিত হইয়াছিল। ইহার মোটামুটী তিনটী অংশ ধরা হইতে পারে। (১) উপক্রমণিকা—ইহাতে সৃষ্টিপ্রকরণ, দক্ষযজ্ঞ, হরপার্ব্বতীর বিবাহ, মদনভস্ম, হরপার্ব্বতীর কোন্দল, মর্ত্ত্যে দেবীর পূজা লইবার কল্পনা; (২) দ্বিতীয় অংশে ভগবতীর চক্রান্তে মহাদেবের শাপে পৃথিবীতে কালকেতুব্যাধরূপে জাত ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরের উপাখ্যান; (৩) তৃতীয় অংশে ভগবতীর চক্রান্তে শাপগ্রস্ত হইয়া খুল্লনারূপে জাত রত্নমালার, খুল্লনার স্বামী ধনপতির এবং পুত্র শ্রীমন্তরূপে জাত শাপগ্রস্ত ইন্দ্রপুত্র মালাধরের উপাখ্যান। কবিকঙ্কণ অনেক পুরাণ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন, একথা নিজেই বলিয়াছেন। দ্বিজ জনার্দ্দনের মঙ্গলচণ্ডী এবং বলরাম কবিকঙ্কণের ও মাধবাচার্য্যের চণ্ডী তাঁহার কাব্যের পূর্ব্ববর্ত্তী। অপর কোন ফুল তাঁহার মধুচক্র নির্ম্মাণে সহায়তা করিয়াছে কিনা, ঠিক জানা যায় না।

উপাখ্যানাংশ কবিকঙ্কণের কল্পনা-প্রসূত না হইলেও যখন তাহা অবলম্বন করিয়া তিনি

কাব্য লিখিয়াছেন, তখন কাব্যোল্লিখিত চরিত্রগুলির বিকাশের জন্য তিনি দায়ী। এই দায়িত্ব মুকুন্দরাম তাঁহার অনেক চরিত্রেই প্রশংসার সহিত পূরণ করিয়াছেন। কালকেতু ও ফুল্লরা, ধনপতি, খুল্লনা ও লহনা দেবীর সহচরী পদ্মা এবং ধনপতির পরিচারিকা দুর্ব্বলা দাসীকে যেন পাঠকের সম্মুখে সজীব ভাবে উপস্থিত করা হইয়াছে। কালকেতু ব্যাধের পাশব বল বা অতিপাশব বল জলদক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে, এখানে আমরা উষ্ণপ্রধানজলবায়ু-জনিত অতিশয়োক্তির ভিতর দিয়া স্বাভাবিকত্ব দেখিতে পাই। কালকেতুর বাল্যজীবন বর্ণনা করিতে গিয়া কবি তাঁহাকে শাপভ্রষ্ট ইন্দ্রপুত্র বলিয়া রাজপুত্রের ন্যায় চিত্রিত করেন নাই—বিক্রান্ত ব্যাধপুত্রের ন্যায়ই চিত্রিত করিয়াছেন। বাল কেতুর

"দুই বাহু লোহার সাবল।
গুণশীল রূপ বাঢ়া, যেন সে শালের কোঁড়া,
জিনি শ্যাম-চামর কুন্তল॥
বিচিত্র কপালতটী, গলায় জালের কাঁঠী,
করযুগে লোহার শিকলী।
বুকে শোভে বাঘনখে, অঙ্গে রাঙ্গা ধূলি মাখে,
তনুমাঝে শোভিছে ত্রিবলী॥
কপাট-বিশাল বুক, নিন্দি ইন্দীবর মুখ
আকর্ণ দীঘল বিলোচন।
গতি জিনি গজরাজ, কেশরী জিনিয়া মাঝ,
মোতি-পাঁতি জিনিয়া দশন॥
দুই চক্ষু জিনি নাটা, ঘুরে যেন কড়ি-ভাঁটা,
কাণে শোভে ফটিক-কুণ্ডল।
পরিধান বীরধড়ী, মাথায় জালের দড়ী,
শিশু মাঝে যেমন মণ্ডল॥
লইয়া কাউড়া ঢেলা যার সঙ্গে করে খেলা,
তার হয় জীবন সংশয়।
যে জনে আঁকড়ি করে পড়য়ে ধরণী-পরে,
ভয়ে কেহ নিয়ড়ে না রয়॥" ইত্যাদি।

শুভদিনে পণ্ডিত আনিয়া কালকেতুর হাতে ধনুক দেওয়া হইল। ধনুর্ব্বাণ পাইয়া "চামের টোপর" মাথায় দিয়া কালকেতু শোভা পাইতে লাগিলেন। তাড়াইয়া হরিণ ধরিতে লাগিলেন—তাহাতে ধনুর্ব্বাণের প্রয়োজন হয় না। পিতা এই পুত্রের বিবাহের জন্য চিন্তিত হইলেন। সোমাই পণ্ডিত সঞ্জয়-সুতা ফুল্লরার সহিত সম্বন্ধ উপস্থিত করিলেন। বিবাহের সম্বন্ধের সময় ফুল্লরার পরিচয়চ্ছলে তাঁহার পিতা সঞ্জয়কেতু বলিতেছেন—

"এই কন্যা রূপে গুণে নামেতে ফুল্লরা।
কিনিতে বেচিতে ভাল জানয়ে পসরা॥
রন্ধন করিতে ভাল এই কন্যা জানে।
যত বন্ধু আইসে তারা কন্যাকে বাখানে॥"

সোমাই পণ্ডিত কন্যার পিতার নিকট কালকেতুর গুণগ্রাম বর্ণন করিয়া উপসংহারে বলিলেন—

"খুঁজিয়া পাইল যেন হাঁড়ির মত সরা।"

অবশেষে—

"পণের নিয়ম কৈল দ্বাদশ কাহণ।
ঘটকালি তাতে ওঝা পাবে বার পোণ॥
পাঁচ গণ্ডা গুয়া দিব গুড় তিন সের।
ইহা দিলে আর কিছু না করিবে ফের॥"

শুভক্ষণ দেখিয়া কালকেতুর সহিত ফুল্লরার বিবাহ দেওয়া হইল। বলা বাহুল্য, কালকেতু ক্রমে মৃগয়ায় সিদ্ধহস্ত হইলেন। মৃগয়ার নমুনা এইরূপ—

"শুণ্ডে ধরি মাতঙ্গেরে আছাড়িয়া মারে।
দন্ত উপাড়িয়া বীর আনে বোঝা ভারে।"

এরূপস্থলে কাজেই

"চুপড়ি মূলা'য়ে দন্ত বেচেন ফুল্লরা।
কুষাণে যেমন বেচে মূলায় পসরা॥"